দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।।
৩১ জানুয়ারি, ২০২২।। ১৭ মাঘ- ১৪২৮।।
যুগাব্দ - ৫১২৩
।। website : www.eswastika.com

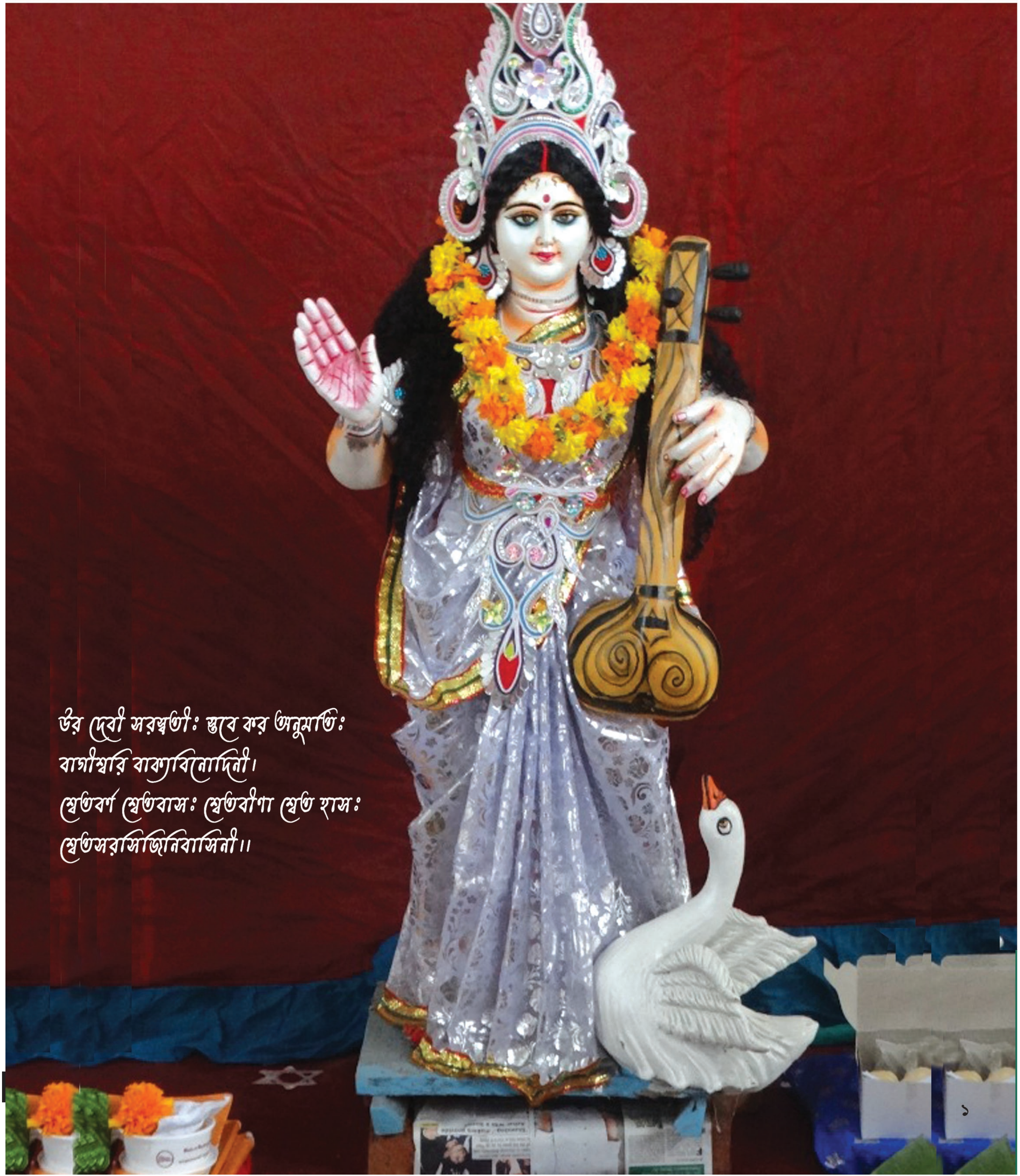

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE NEW AGE PANELS
SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ১৭ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৩১ জানুয়ারি - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

নরেন্দ্র মোদীর নেতাজী সম্মানে কি কুপোকাত 'বেহেন মমতা ব্যানার্জি' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মোদীর অপমান ও বাংলার গর্ব ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

দক্ষ প্রযুক্তিবিদ এবং হিন্দু এখন প্রায় সমার্থক শব্দ ◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

বাঙ্গালির আইকন সুভাষচন্দ্র বসু ◻ অরূপ সরকার ◻ ১০

ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থের বলি হয়েছিল প্রাচীন আয়ুর্বেদ ◻ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ◻ ১১

আমাদের দেশ কি সংবিধান নির্দেশিত পথে চলতে পারছে? ◻ রঞ্জনা মিশ্র ◻ ১৩

আইএএস, আইপিএস অফিসারেরা অসভ্যতা-বর্বরতার নজির স্থাপন করছেন ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৫

সবকিছুই তো চলছে, শিক্ষার দ্বার বন্ধ কেন? ◻ বরুণ মণ্ডল ◻ ১৭

জৈব গ্যাসের ব্যবহারে কমবে অপরিশোধিত তেলের আমদানি ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ১৮

নদী থেকে দেবী ◻ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৩

বাণী বন্দনায় বসন্ত বরণ ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ২৪

সরস্বতী বন্দনা একটি অসাম্প্রদায়িক উপাসনা ধারা ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২৬

অন্ধ্রপ্রদেশের কোদণ্ডরামা মন্দির ◻ কৌশিক রায় ◻ ৩১

একটি নমস্কারে বলা হয়ে যায় অনেক কিছু ◻ রণজিৎ গুহ ◻ ৩২

ভারতের সংস্কৃত অলংকৃত মহাকাব্য ◻ অমিতঘোষ দস্তিদার ◻ ৩৩

সরস্বতী পূজা ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার উদ্‌যাপন ◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৩৫

ধর্ম ও বিকৃতির ঊর্ধ্বে শুভ্রতায় মোড়া দেবী সরস্বতী ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ৩৯

এশিয়াটিক সোসাইটিতে জাতীয় গণিতদিবস উদ্‌যাপন ◻ সৌমেন নিয়োগী ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ স্মরণে : ৪৬ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
৭ ফেব্রুয়ারি
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৭ ফেব্রুয়ারি
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কারও সর্বনাশ কারও পৌষমাস

পশ্চিমবঙ্গে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ। পঠনপাঠন চলছে অনলাইনে। কিন্তু সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যেই চলে এসেছে বেশ কয়েকটি অনলাইন টিউটোরিয়াল অ্যাপ। এদের গ্রাহক সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। করোনা এবং ওমিক্রনকে কেন্দ্র করে দু'বছর ধরে মানুষকে শোষণ করছে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিও।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা এসব নিয়ে। লিখবেন ড. রাজলক্ষ্মী বসু, স্বপন দাস প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from -

A Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভগবতী ভারতী

ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। এই ভারতভূমিতেই প্রথম মনুষ্যজাতির যথার্থ স্বরূপ এবং অন্তরমনের রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। এইখানেই ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ইহা হইয়াছিল কোনো নদীকে কেন্দ্র করিয়া। প্রাচীন ভারতের সর্ববৃহৎ নদী ছিল সরস্বতী। সরস্বতী নদীর দুই পার্শ্বে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য ঋকবেদ এবং যজু ও অথর্ববেদে এই নদীর উল্লেখ রহিয়াছে। বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতের মতে সিন্ধুনদ নহে, সরস্বতী নদীই বৈদিক সভ্যতার জন্মদাত্রী। যে নদীর তীরে সুমহান একটি সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল সেই নদী দেবীত্বে উন্নীত হইবারই কথা। তাই স্বাভাবিকভাবেই সরস্বতী নদী হইতে দেবীত্বে উন্নীত হইয়াছিল। বৈদিক সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইবার কারণে নদী সরস্বতী জ্ঞান বা বিদ্যার দেবীতে পরিণত হইয়াছেন। তাই ভারতবর্ষের যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেবী সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী ও বিদ্যাদায়িনী রূপে পূজিত হইতেছেন। প্রাকৃতিক কারণে এক সময় নদী সরস্বতী তাঁহার গতি হারাইয়া লুপ্ত হইলেও ভারতবর্ষের মানুষের অন্তরে দেবীরূপে পূজিত হইতেছেন। শুধু ভারতবর্ষেই নহে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও জ্ঞানের দেবী রহিয়াছেন। প্রাচীন সব সভ্যতাতেই জ্ঞানের দেবী রহিয়াছেন। গ্রিক পুরাণে জ্ঞান, চারু ও কারুশিল্পের দেবী হইলেন অ্যাথিলা। জাপানে জ্ঞানের দেবী হইলেন বেনজাইতেন। পশ্চিম টোকিয়োর ইনকাশিরা পার্কে রহিয়াছে জাপানের বিখ্যাত সরস্বতী মন্দির। জাপানের সরস্বতী মন্দিরগুলি জলাশয়ের পাশেই নির্মিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও মন্দিরে বিগ্রহ নাই, জলাশয়কেই দেবীজ্ঞানে তাহারা পূজা করেন। বারোশত বৎসর ধরিয়া জাপানিরা তাহাদের সরস্বতী বেনজাইতেনের আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। জাপানের সরস্বতী ভারতবর্ষের বাঙ্গলার ন্যায় দ্বিভুজা হইলেও ইদানীং চতুর্ভুজা ও অষ্টভুজার আরাধনাও শুরু হইয়াছে। ভারতবর্ষের মা সরস্বতীর হাতে যেমন বীণা রহিয়াছে, তেমনই জাপানের সরস্বতীর হাতেও রহিয়াছে বীণা। জাপানি ভাষায় তাহাকে বিওয়া বলা হয়। অনুরূপভাবেই চীনদেশে সরস্বতীর নাম বিয়ান সাই তিয়ান, কোরিয়ায় বাইওয়েনজাই, থাইল্যান্ডে সুরাটস্বোয়াদি, তিব্বতে ইয়ান চেংমা, ভিয়েতনামে বয়েন তাই থিয়েন, মায়ানমারে যুবাথাদি। উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, জাপানে একশতেরও বেশি সরস্বতী মন্দির রহিয়াছে।

বস্তুত, জ্ঞানের দেবী সরস্বতী আজ শুধুমাত্র কোনো জাতি বা কোনো ধর্ম বিশেষের দেবী নহেন, তিনি যেকোনো জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি, জাতি বা দেশের আরাধ্যা হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, মধ্যযুগে হানাদার ইসলামি বাহিনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যামন্দিরও ধ্বংস করিয়াছে। বিখ্যাত ভোজশালা সরস্বতী মন্দিরটি তাহারা কামিল মওলা মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছে। মা সরস্বতীর এই মন্দিরটি স্থাপত্যরীতি ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে জগদ্‌বিখ্যাত ছিল। দেশ-বিদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসিতেন। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একদা জ্ঞানচর্চার বড়ো পীঠস্থান তথা মা সরস্বতীর আরাধনাকেন্দ্র সারদাপীঠটি অত্যাচারী বিধর্মীদের কবলে পড়িয়া আজ শুধু এক খণ্ডহরে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। পরিতাপের বিষয় হইল, দেশ স্বাধীন হইবার পরও ভোজশালা মন্দিরে মা সরস্বতীর আরাধনার অধিকার পাওয়া যায় নাই। বিধর্মীদের কবলেই তাহা রহিয়াছে। শিল্পীর স্বাধীনতার নামে মা সরস্বতীর নগ্নচিত্র আঁকা হইয়াছে। বিকৃত রুচির সাহিত্যিকের কলমে মা সরস্বতীকে বিকৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আজ আমাদের এই রাজ্যে বহু বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সরস্বতী-আরাধনা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। বিদ্যামন্দিরে মা সরস্বতীর আরাধনায় সরব হইলে ছাত্রীর মাথা রক্তাক্ত করিয়াছে এই রাজ্যের পুলিশ। সরস্বতী পূজার প্রাক মুহূর্তে একদা ভারতবর্ষেরই অঙ্গ প্রতিবেশী দেশে নির্মীয়মাণ সরস্বতী প্রতিমা ভেঙে ফেলা হইয়াছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতেছে, জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর প্রতি এত বিদ্বেষ কেন? উত্তর খুবই সহজ। বিদেশি মতাদর্শে জারিত একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং জেহাদি শক্তির পৃষ্ঠপোষক রাজনীতিক ভারতবর্ষের গরিমাময় সভ্যতাকে অস্বীকার করিতেছেন। মা সরস্বতীর আর এক নাম ভারতী অর্থাৎ ভারতবর্ষ। এই কায়েমি স্বার্থান্বেষী ভোটলোলুপরা সরস্বতী বিরোধিতার নামে ভারতীয় জনমানস হইতে ভারতীয়ত্বকে ভুলাইয়া দিতে চাহিতেছেন। সুখের বিষয়, রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন মানুষ ইহাদের ভণ্ডামি ধরিয়া ফেলিয়াছে।

সুভাষিতম্

ন চোরহার্যম্ ন চ রাজহার্যম্ ন ভ্রাতৃভাজ্যম্ ন ভারকারী।

ব্যয়ে কৃতে বর্ধতে এব নিত্যং বিদ্যাধনং সর্বধনপ্রধানম্।।

চোর চুরি করতে পারে না, রাজা ছিনিয়ে নিতে পারে না, ভাইয়েদের মধ্যে ভাগ করা যায় না, যা কখনোও ভার মনে হয় না, ব্যয় করলে যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি হয়, সেই বিদ্যধনই সর্বধনের শ্রেষ্ঠ।

নরেন্দ্র মোদীর নেতাজী সম্মানে কি কুপোকাত ‘বেহেন মমতা ব্যানার্জি’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ইন্ডিয়া গেটে বসেছে নেতাজীর গ্র্যান্ড স্ট্যাচু। দেশনায়ককে যে বিরল এই সম্মান দেখানো যায় ৭৮ বছরে কোনো রাজনৈতিক দল বা সরকার আঁচ করতে পারেনি। বলা চলে তাদের মাথাতেও আসেনি। আমরা মতে এটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘রাজনৈতিক সংকল্প’। এর ধাক্কা সামলাতে বিরোধীদের হিমশিম খেতে হবে।

গত বছর ২৩ জানুয়ারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ‘পরাক্রম দিবস’ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘বেহেন’ বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির কিছু অতি উৎসাহী দর্শক ধ্বনি দিয়ে মমতাকে উত্যক্ত করায় তিনি বক্তৃতা করতে অস্বীকার করেন। তাঁকে শান্ত করতেই মোদী হয়তো এই সম্বোধন করেছিলেন। ১৬ জানুয়ারি ২০২২ ‘বেহেন’ মমতা মোদীকে প্রতিবাদপত্র পাঠান। গণতন্ত্র দিবসের কুচকওয়াজ থেকে রাজ্যের নেতাজী ট্যাবলো বাদ পড়ার সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ জানিয়ে দেন ‘সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে ছিল না।’ বিদ্বজ্জনের নিরপেক্ষ কমিটি ট্যবলো খারিজ করেছে। কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর (সিপিডব্লুডি)-র তৈরি অনুরূপ নেতাজী ট্যাবলো অনুমোদিত হয়েছে। তাই রাজ্য বাদ পড়েছে।

মানে একটি কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে ও যুক্তি হাস্যকর তবে নজীরবিহীন নয়। বিজেপি শাসিত অসম আর বিজেপি বিরোধী তামিলনাড়ুর ট্যাবলো বাদ পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন প্রতিবাদ জানালেও স্বাভাবিকভাবে অসম প্রতিবাদ করেনি। পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। জার্মানি থেকে তথাকথিত নেতাজী কন্যা অনিতা পাফ বসু বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন ‘নিশ্চিত কোনো কারণ রয়েছে। তবে সেটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না’।

আমিও বুঝিনি কোন কারসাজিতে বাদ গেল ট্যাবলো? রাজ্যে মমতা বিরোধী বিজেপির দুই মুখ। নরেন্দ্র মোদী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাহলে কি? এবারে ২৯টি রাজ্য আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ট্যাবলোর মধ্যে ১২টি নির্বাচিত হয়। ২০১৪ সাল থেকে গুজরাটের কোনো ট্যাবলো খারিজ হয়নি। গত আট বছরে ৪ বার রাজ্যের ট্যাবলো খারিজ হয়েছে। ২০১৬-তে একবার পুরস্কার পেয়েছে।

একক আর যৌথভাবে বিজেপি ১৮ রাজ্যে ক্ষমতায়। কংগ্রেস ৬। বাকিতে অবিজেপি বা অকংগ্রেস জোট। তাই ১৭টি ট্যাবলো খারিজ মানে অসম ছাড়াও বিজেপির অন্য রাজ্যের ট্যাবলো খারিজ হয়েছে। এবারের মোট ৫৬টি ট্যাবলোর মধ্যে ২১টি অর্থাৎ ৬২ শতাংশ অনুমোদন পায় আর ৩৮ শতাংশ বাতিল হয়। আদর্শ পুরুষ নেতাজীকে নিয়ে কেন্দ্র আর রাজ্যের এই দড়ি টানাটানি একেবারেই কাম্য নয়। এটা সবাই মানলেও মানে না কলকাতার কিছু বিকিয়ে যাওয়া সংবাদপত্র। তাই তারা

> **তৃণমূলে শুরু হয়েছে ‘তিন ব্যানার্জির’ লড়াই। এক ব্যানার্জি তিনি ছাড়া রয়েছেন তাঁর একদা ঘনিষ্ঠ সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি।**

‘লয়াল দ্যান দ্য কিং’ সেজে কেন্দ্রীয় সরকার নেতা-মন্ত্রীদের নিম্নরুচির কদর্য আক্রমণ করেন। তারা নির্দেশে চলেন আর তাই তা পালন করেন।

নেতাজীকে সম্মান জানানো নিয়ে মোদী সরকার যতটা করেছেন মমতা ততটা না পারলেও তাঁর সদিচ্ছা মৌখিকভাবে বুঝিয়েছেন। কয়েকটি হারিয়ে যাওয়া নেতাজী ফাইল তিনি প্রকাশ করেছেন আর ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিনকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু এক বছরে নেতাজীর ১২৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন কমিটির একটি বৈঠক করেননি। তা মোদীও করেননি। এক বছর আগে টুইট প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাজারহাটে কোনো ‘আজাদ হিন্দ বা আইএনএ মেমোরিয়াল’ তৈরি করেননি। নেতাজীর নামে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরিতেও উদ্যোগী হননি। মোদী সরকার আন্দামানের ৩টি দ্বীপ— রস, নীল আর হ্যাভলক নেতাজী আর স্বাধীনতার বীর বিপ্লবীদের স্মৃতিতে নিবেদন করেছেন। ইন্ডিয়া গেটে নেতাজীর একটি ‘গ্র্যান্ড স্টাচু’ বসিয়েছেন। নেতাজী অন্তর্ধানের ৩৩টি ফাইল প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সরকারিভাবে ঘোষণা করতে পারেননি নেতাজীর শেষ পরিণতি কী ছিল। মোদী আজাদ হিন্দ ফৌজের ৭৫তম বার্ষিকীতে লালকেল্লায় পতাকা তুলেছেন। মমতার এখন শাঁখের করাত। তৃণমূলে শুরু হয়েছে ‘তিন ব্যানার্জির’ লড়াই। এক ব্যানার্জি তিনি ছাড়া রয়েছেন তাঁর একদা ঘনিষ্ঠ সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি। দুজনেই জোরের সঙ্গে মমতাকে নেতা বলে মানছেন। নাম না করে বলছেন তারা আর কাউকে মানেন না। অর্থাৎ দুজনে দুজনকে মানেন না। এখন দেখার নেতাজী অধ্যায় সমাপনের পর মমতা কার নেত্রী হন। সে দিকে তাকিয়ে রইলাম। ■

মোদীর অপমান ও বাংলার গর্ব

সুন্দর মৌলিক

প্রণাম নেবেন দিদি। ফের কেন্দ্রের এক সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আপনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার টনক নড়িয়ে দিয়েছেন। আইএএস সার্ভিস রুলে সংশোধনীর বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী বলে দাবি করে আপনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। গত ১৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পাঠানো চিঠিটা পড়েছি দিদি। ন্যায্য কথা বলেছেন। কিন্তু এটা করলে দেশ চলবে কী করে? জানি, এই প্রশ্ন উঠবে, উঠছেও কিন্তু আপনি পাত্তা দেবেন না। দেশ নয় দিদি, রাজনীতি আগে। কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনের জন্য আইএএস অফিসারদের বর্তমান পরিষেবা বিধিতে প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রত্যাহার করুক কেন্দ্র। দেশ হারলেও রাজনীতি জিতুক। দরকার হলে কয়েকটা মামলাও ঠুকে দিন দিদি।

দিদি, আমরা সবাই এটা জানি যে, ১৯৫৪ সালের আইএএস ক্যাডার রুল সংশোধনী প্রসঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হোক না। তাতে আমার আপনার কী! বুঝবেন মোদী। এটা আলোচনা করলে ঠিক হয়ে যেতে পারে কিন্তু দিদি সেই সুযোগ দেবেন না। পরিস্থিতি যত প্যাঁচালো হবে তত আপনার লাভ। দিদির লাভ মানেই আমার ইংরেজি লাভ, মানে ভালোবাসা।

এবার নিয়মের কথা বলি, আইসিএস থেকে আইএএস হলো। আর তাদের নিয়োগের ভার পড়ল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-এর উপরে। নিয়োগের পর আইএএস-দের রাজ্য ক্যাডারে বণ্টন করা হয়। তখন থেকেই তাঁরা রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে যান। শুধুমাত্র কোনও রকমের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাজ্য ওই অফিসারদের বিরুদ্ধে নিতে পারে না। রাজ্যকেই ঠিক করতে হয় প্রতি বছর নতুন ক'জন আইএএস অফিসার প্রয়োজন। কত জন অফিসারকে কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটেশনে পাঠাতে হবে। আর কত জন অফিসার এ বছর অবসর নেবেন। অন্য দিকে, কতজন অফিসার কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডেপুটেশনে' যাবেন সেই তালিকা রাজ্য পাঠালে কেন্দ্র তাঁদের সকলকে নেবে এমন কোনও কথা নেই। তবে রাজ্য মনে করতেই পারে কোনও অফিসার কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁকে 'ডেপুটেশনে' পাঠানো যাবে না। সেই অনুযায়ী 'অপশন' নিয়ে তালিকা তৈরি হয়। আবার কোনও অফিসার যেতে চাইলেই যে তাঁকে রাজ্য যেতে দেবে, এমনটাও নয়। পুরোটাই রাজ্যের হাতে।

এখন কেন্দ্রের হাতে নাকি কাজ করার মতো পর্যাপ্ত অফিসার নেই। কম পড়েছে। এটা মাঝে মাঝেই হয়। হতেই পারে। তখন রাজ্য থেকে নিতে হয়। এখন রাজ্য যদি না পাঠায় তবে কেন্দ্র কী করবে! তারাই-বা কাজ চালাবে কী করে! রাজ্যের হাতে সবটা থাকলে তারা সব সময় পর্যাপ্ত সংখ্যার অফিসার কিন্তু কেন্দ্রে 'ডেপুটেশনে' পাঠাচ্ছে না। তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার কাজকর্ম চালাবে কী ভাবে? তাদেরও তো যোগ্য অফিসার প্রয়োজন। না হলে সিস্টেমটা চলবে কী করে! এসব প্রশ্ন উঠবে দিদি। কিন্তু আপনাকে ভাবলে চলবে না। মোদী সরকার চলবে কী করে সেটা তাদের ভাবনা। আপনি গোঁ ধরেই থাকুন। পারলে আরও কিছু রাজ্যকে এর সঙ্গে জুড়ে নিন। তাতে বিপাকে পড়ুক মোদী সরকার। আপনার কী, আমারই-বা কী!

কিন্তু আপনি না চাইলেও কিছু অফিসার কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে যেতে চান। তাঁদের যাওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। না হলে তো বড়ো কাজ করার অভিজ্ঞতা হবে না! কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ করা মানে তো দেশ জুড়ে কাজের সুযোগ। অনেক ধরনের সুযোগ। তার সঙ্গে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা। একজন অফিসারের এই অভিজ্ঞতা না হলে তিনি সিস্টেমের জন্য অপরিহার্য হবেন কী ভাবে? আর যে কোনও অফিসার সেটা অবশ্যই হতে চাইবেন। চান-ও। ফলে রাজ্যের কাছে অপরিহার্য হতে গিয়ে কেউ কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে যেতে পারেন না। সেটাও ভাবতে হবে রাজ্যকে কারণ এখনও পর্যন্ত যা নিয়ম, তাতে সবটাই রাজ্যের হাতে।

অনেকে বলছেন রাজ্যের এই গোয়ার্তুমির জন্যই কেন্দ্র নীতি বদলাতে চাইছে। এত দিনের রুলের বদল চান মোদীও। কিন্তু চান তো চান! আমাদের কী। আপনারই-বা কী! আপনি চুপ করে সবাইকে ধরে রাখুন। আসলে দিদি মনে রাখতে হবে দেশ থাকবে। কিন্তু রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। □

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

দক্ষ প্রযুক্তিবিদ এবং হিন্দু এখন প্রায় সমার্থক শব্দ

অতি সম্প্রতি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার যে প্রচেষ্টা চলছে তা এখুনি বন্ধ হওয়া দরকার। অনেকে এটিকে নিছক রাজনৈতিক propaganda বলে খাটো করে দেওয়ার চেষ্টা করলেও প্রধানমন্ত্রী এই চেষ্টাকে গোটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। এই সূত্রে American Data Intelligence-এর প্রকাশিত সাম্প্রতিক গ্লোবাল রেটি সমীক্ষায় বিশ্বের জনপ্রিয় নেতাদের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২১ সালেও আজকের মতোই ৭১ পয়েন্ট পেয়ে তিনিই শীর্ষস্থানে ছিলেন। ভারত ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, মেক্সিকো, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার মতো ১২টি দেশের মধ্যে এই নির্বাচন প্রতিযোগিতা চালু আছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি বিশ্বে যেমন ইসলাম, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মের বিরুদ্ধাচারণকে Islamophobic বা christanphobia ইত্যাদি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয় তেমনি হিন্দু ধর্মের চিরন্তন বিরোধিতা ও ধর্মস্থান আক্রমণ প্রভৃতি অপকর্মকে Hinduphobia বলে চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জোরালো দাবি জানিয়েছেন। এই পটভূমিতে দেশের অভ্যন্তরে চিরকাল যত্নে লালিত তথাকথিত উদারবাদীদের আক্রমণ নিয়েই এবারের অতিথি কলম।

মোদী সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে ভারত একটি অনুদার, অসহিষ্ণু ভাবধারা প্রচারকারী দেশ বলা উদারবাদীদের সাম্প্রতিকতম কৌশল। অতি স্বল্প পরিচিত কিছু সাধু-সন্ত ধর্মসংসদ বলে নিজেদের একটি সংগঠনের অভ্যন্তরে হিন্দু ধর্মের স্বপক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন তাই নিয়ে কাজকর্ম থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কিছু তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নির্দিষ্ট কিছু মিডিয়ার পরিচালকরা সপাটে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হ্যাঁ, উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন না থাকলে তারা হয়তো এতটা ক্ষেপে উঠতেন না। নির্বাচন হলো এমন একটা সন্ধিক্ষণ যখন পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার ভিত্তিতে জমে থাকা বিক্ষোভকে প্রকাশ্যে এনে নির্বাচনী কিছু এসপার ওসপার করার একটা সুযোগ থেকে যায়। অবশ্যই এই বিরোধিতার যৌক্তিকতা থাকতে পারে আবার তা নিতান্তই ঈর্ষাপ্রসূতও হতে পারে কিন্তু গুছিয়ে ভোটারের পাতে দিতে পারলে কার্যসিদ্ধি হতেও পারে। এমনই আশা।

অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে বলা হচ্ছে ভারতে ২০১৪ সাল থেকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বক্তৃতা দেওয়ার একটা পরিকল্পিত চেষ্টা নিরন্তর চলে আসছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে যে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবেগপ্রবণ বক্তৃতার বন্যা বয়ে যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু অনেকের কাছে ঘৃণা উদ্রেককারী মনে হয় আবার কারুর কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক লাগে। অবশ্যই সংসদীয় শিষ্টাচার কিছুটা রেখে ঢেকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বক্তব্য রাখতে হয়। বিদ্রূপাত্মক বা কৌতুকের মাধ্যমে আক্রমণ অনেক পরিশীলিত হতে পারে। কিন্তু আজকের উন্মাদনায়, উচ্চকিত প্রচারের কাছে এই ধরনের মৃদু পর্দার প্রচার একেবারেই বেখাপ্পা মনে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আদালতের হস্তক্ষেপ। দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে নির্বাচিত সরকার, যাকে নির্দিষ্ট সময়ের পর জনতার দুয়ারে জবাবদিহি করতে হয়, বিচারব্যবস্থাকে তা করতে হয় না। এ বিষয়ে তারা এক অর্থে কিছুটা সংখ্যালঘু। রাজনৈতিক হিসেব নিকেশ বা ভূমিকার ক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। এখন যে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা কার্যপ্রণালীকে আদালতে নিয়ে গিয়ে ফেলা ও তা নির্বাচিত সরকারের সিদ্ধান্তের বিপরীতে গেলে সর্বোচ্চ ধরে নেওয়ার প্রবণতা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সর্বদা হিতকর নয়। ভারত একটি ‘অনুদারবাদী রাষ্ট্র’ এবং সেই কারণে তাকে সঠিক পথে পরিচালনার দায় আদালতের। এই ধারণাকে মান্যতা দিতেই কিছু তথাকথিত উদারবাদী দিন-রাত আদালতের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে আছেন। আদালতের মাধ্যমে এই তথাকথিত ন্যায় আদায়ের চেষ্টার পেছনে লুকিয়ে আছে জনগণের দ্বারা একটি নির্বাচিত সরকারকে তার অর্জিত অধিকার ও দায়িত্ব পালনে বিচ্যুত করা যা আর এক অর্থে জনতার mandate-কেই অমান্য করা। শুধু তাই নয়, উদারবাদীদের আরও একটি উদ্দেশ্য আদালতের মাধ্যমে এমন কিছু কূটকাচালি তৈরি করা যা সরকারের কাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ও জনতার রায়ের বিরোধী। কিন্তু মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর তাতে সুবিধে। একটা উদাহরণ দেখুন, হরিদ্বারের ধর্ম সংসদের কোনো সাধুর ‘গণহত্যার ডাককে’ আক্ষরিক অর্থে মেনে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মদন লকুর যেন কালই এমনটা ঘটতে চলেছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন। কথার কথা বলা এক জিনিস আর বাস্তব এক জিনিস। উদারবাদী কর্মীরা আদালতের কাছ থেকে এখনই সব ‘শয়তানের

রায়' আদায় করতে চাইছেন যাতে সবাই কাজটা সরকার করেছে এমনটা ধরে নেয়।

নির্দিষ্ট কায়েমি স্বার্থধারীরা কিছু গেরুয়াধারী যারা নিজেদের বক্তব্যে লাগাম দিতে ব্যর্থ এমন হিন্দুদের কাঁধে বন্দুক রেখে মোদী সরকারকে মলিন করতে চাইছে। তারা বক্তব্যের ভিত্তিতে ওই সাধুদের জেলে পুরে বরাবরের জন্য লকআপের চাবি সমুদ্রে ফেলে দিলে ভালো হয় এমনটা আশা করছেন। তাদের কাছ থেকে এটা প্রত্যাশিত।

গত ৭ বছর ধরে এই উদারবাদী গণতন্ত্রের ধারক ও বাহকরা ভয়ার্ত ও নিদারুণ হতাশার বলি। তাঁরা অনুভব করেছেন তাদের সাজানো বাগান ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের সৃষ্ট ভাব-পৃথিবী যেন নীচ থেকে ওপরে উঠে গিয়ে সব ওলট পালট করে দিয়েছে। তারা একটা নতুন বাক্যবন্ধ ছেড়েছেন অবশ্যই ইংরেজিতে 'Neo Sultanism' অর্থাৎ এক অর্থে স্বৈরতান্ত্রিক একনায়ক। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে বর্তমান সরকার মাথা ঘামায়নি। তারা জানে যখনই সত্যিকারের দেশহিতকর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার এগিয়েছে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সরকার আরও নতুন পরিবর্তনের দিকে ফোকাস ঘুরিয়েছে যেগুলি এদের একেবারে পরিতাজ্য বলে মনে হয়েছে।

তাঁরা মনে করছেন যদিও ভারত ন্যূনতম মাত্রায় একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ কিন্তু মোদী সরকার সেই পরিসরের মধ্যে সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত Majoritarian State নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, বিজেপির মূল লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দুদের স্বার্থকে প্রথমেই সুরক্ষিত করা এবং এটিই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এই লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে অন্যদের অর্থাৎ সংখ্যালঘু স্বার্থে আঘাত দিতে কোনো বাধা নেই।' পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে ভারত ক্রমশ ইজরায়েলের মতো অনুদারবাদী গণতান্ত্রিক দেশ হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতে তা নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান্যের গণতন্ত্র হয়ে উঠবে। অবশ্যই নরেন্দ্র মোদীর এই ৭ বছরের কার্যকালে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত Neheruvian secularism- র নাগপাশ থেকে অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা থেকে দেশকে বের করে আনার প্রচেষ্টা থাকাটাই স্বাভাবিক। হাতের কাছেই উদাহরণ গত মাসে এ যাবৎ অচিন্ত্যনীয় এক অনিন্দ্যসুন্দর কাশী বিশ্বনাথ করিডোরের নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক উন্মোচন দেশবাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এরই পাশাপাশি যোগী আদিত্যনাথের কৃষ্ণজন্মভূমি মথুরায় আর একটি সমান গৌরবময় মন্দির নির্মাণের প্রতিজ্ঞা দেশকে টগবগে করে তুলেছে। অন্যদিকে অযোধ্যায় নির্মীয়মাণ সুরম্য রামমন্দির দ্রুত সমাপ্তির পথে। এই নির্মাণ-পুনর্নির্মাণগুলির প্রচেষ্টাই পুনর্জীবিত উত্তরাধিকার ও নবরূপে বিকশিত এক নতুন ভারতের সংজ্ঞা নির্ধারণ করছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৫০ সালে সোমনাথ মন্দির নির্মাণ ও উদ্বোধন নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অনীহা প্রবাদপ্রতিম। তিনি উন্মোচনে যাননি। কিন্তু আজকের বারাণসী ও অযোধ্যার মন্দিরের ক্ষেত্রে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর গভীর আগ্রহ ও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ যে তথাকথিত উদারবাদীদের হতাশা ও বিক্ষোভের কারণ হবে তা অনুমান করা যায়। তাঁরা দিন বদল হজম করতে পারবেন না এমনটাই অনেকে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু হায়! অবস্থা এতটাই বেগতিক যে প্রধান বিরোধী দলের নেতারাও সব ভুলে তাঁরাও যে হিন্দু স্বাভিমানী প্রমাণ করতে এই সমস্ত মন্দির ও দেবস্থানগুলিতে লাইন লাগাচ্ছেন। হিন্দুদের বিষয়ে কথা বলা, ভাবা, তাদের অনুভূতি গুলির মর্যাদা দেওয়া এখন একটা জাতীয় ঐকমত্যের স্তরে পৌঁছে গেছে। জাতীয় চরিত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কাণ্ডারি হিসেবে ভবিষ্যতে মোদী না থাকলেও চিরকাল তাঁর নাম ইতিহাসে থেকে যাবে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদী সযত্নে সংখ্যাগুরুর স্বার্থসংরক্ষণকারীর তকমাকে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর 'সবকা সাথ' কথাটি তিনি কার্যক্ষেত্রে সগৌরবে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে একটি নজরে পড়ার মতো পরিবর্তন ধীরে কিন্তু অভ্রান্তভাবে ঘটে গেছে। আগে যে হিন্দু নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত বোধ করত এমন সে তার হিন্দু পরিচয়ের জন্য গর্ববোধ করছে। আজকের ভারত হিন্দু হওয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতা বা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের কোনো বিরোধ দেখছে না। একজন শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ হিন্দু হিসেবে দেশে বিদেশে সম্মানিত বোধ করছেন। শুনলে হয়তো অবাক হবেন আজ হিন্দু আর কম্পিউটার কুশলী দক্ষ প্রযুক্তিবিদ সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে অন্যের পরিপূরক। নব্য ভারতের মন্দিরগুলি কাশী পঞ্চক্রোশীর সঙ্গে চন্দ্রায়ন একই সঙ্গে গ্রহণ করেছে। অসুবিধে তখনই হয় এত সুন্দর একটি পুনরুত্থানকে যখন কিছু গরম মস্তিষ্কের লোক আলটপকা মন্তব্য করে সীমিত বিরুদ্ধবাদীদের সুবিধে করে দেন। □

পরলোকে বাংলা কমিকসের কিংবদন্তী শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ

বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। গত কয়েক প্রজন্মের বাঙ্গালির পাঠচর্চার সঙ্গী হয়ে

রয়েছে তাঁর 'বাঁটুল দ্য গ্রেট', 'হাঁদা-ভোঁদা', 'নন্টে-ফন্টে'। চল্লিশের দশকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন। অসামান্য দক্ষতায় তিনি ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর চিত্র অঙ্কন করেন। এখন তা শিবপুর সঙ্ঘ কার্যালয়ে রয়েছে। ২০০৭ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৩ সালে বাল সাহিত্য অ্যাকাডেমি ও বঙ্গবিভূষণ, ২০১৫ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট এবং ২০২১-এ পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। উল্লেখ্য, শ্রীগুরুজীর জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সমিতির তিনি সদস্য ছিলেন। গত ২০ জানুয়ারি এক স্মরণসভায় স্বয়ংসেবকরা তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

বিশেষ প্রতিবেদন

বাঙ্গালির আইকন সুভাষচন্দ্র বসু

অরূপ সরকার

সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন, 'বহুকষ্টে এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই শুধু একটি জাতিকে আমরা নির্মাণ করতে পারি'। মাত্র শতবর্ষ আগের ঘটনা ব্রিটিশের ভয়ংকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাত-কঠিন স্নায়ু ও বজ্রভীষণ লক্ষ্য নিয়ে একদল বাঙ্গালি যুবক। স্বদেশী আন্দোলনের কপি রাইট তাঁদেরই। ভ্রান্ত বামপন্থীয় প্রচারে তা সকলের হয়ে যায় না, সকলের হলে তো বঙ্গভঙ্গই হতো না।

১৯১৬ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজ। উনিশ বছরের একজন তরুণ ছাত্র নেতৃত্ব দিয়ে পেটালেন তীব্র ভারতবিদ্বেষী ওটেন সাহেবকে। সেই শুরু। সেই ঘটনা সুভাষকে ভবিষ্যতের নেতা থেকে নেতাজী হওয়ার পথে এগিয়ে দেয়। যদিও পরবর্তীতে সেই ভারতবিদ্বেষী ওটেন সাহেবই হয়ে ওঠেন প্রবল ভারতপ্রেমী এবং ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ক বেশ কিছু বই ও নেতাজীকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সে অন্য কথা। চার বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২০ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ হলেন মেধাবী সুভাষ। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরির প্রস্তাব ঘৃণাভরে ত্যাগ করলেন।

যখন বড়ো ভাইকে চিঠি লিখে জানালেন তিনি আইসিএস হবেন না, তখন বাঙ্গালিকে তা উদ্বেলিত করল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমলেন্দু দে লিখেছেন, 'অতবড়ো লোভনীয় একটা পদ পরিত্যাগ করলেন তিনি দেশের স্বার্থে। এটা বাঙ্গালির মনে একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। বহুদিন ধরে বাঙ্গালি আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশসেবা করার যে আদর্শ তুলে ধরেছিল, যার জন্য অগণিত লোক আন্দামানে নির্বাসন বেছে নিয়েছিলেন সেই ধারাটিকে আরও প্রজ্বলিত করলেন সুভাষ বসু।' তিনি মনে করতেন ভারতের যা কিছু হৃতগৌরব তা বাঙ্গালিদেরই ফিরিয়ে আনতে হবে।

কিন্তু বাঙ্গালির তো দোষও আছে; অনেক

দোষ। সেজন্যই বাঙ্গালি অন্তর্কলহে জর্জরিত হয়ে সর্বভারতীয় স্তরে পিছিয়ে পড়ছে, লুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। বাঙ্গালির এই কাঁকড়াসদৃশ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করে সুভাষচন্দ্র লিখলেন, 'অধঃপতন আর কতদূর গড়াবে তা শুধু ভগবানই জানেন। বাঙ্গালি নিজেকে সস্তা দরে বিক্রয় করে একগালে চুন আর একগালে কালি মেখে বসে আছে। বাঙ্গালির অধঃপতন চরমে পৌঁছতে আর কত দেরি আছে তা আমরা জানি না। কে জানে কত দুঃখ, কত লজ্জা বাঙ্গালির কপালে আছে? এখনও সময় আছে তার প্রতিকার করবার। বাঙ্গালির গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালির যে স্থান ছিল সে স্থান ফিরে পেতে হবে। পরিবর্তন-বিরোধীরা বাঙ্গালির নাম ভারতের সম্মুখে কলঙ্কিত করেছেন, এ কলঙ্ক আমাদের ঘোচাতে হবে। ভারতকে যেমন বাঁচাতে হবে, বাঙ্গলার নামও সেরূপ চিরকালের জন্য উজ্জ্বল রাখতে হবে। বাঙ্গলার নষ্ট খ্যাতি ও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে যিনি সহায়তা করবেন বাঙ্গালি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।' এই কথাগুলো কিন্তু আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক।

তিনি মনে করতেন, বাঙ্গালির সারা পৃথিবীতে যে একটা গৌরবোজ্জ্বল স্থান আছে, তার উপযোগী কর্তব্যও বাঙ্গালির সামনে পড়ে আছে। ব্রিটিশদের ভারতে প্রবেশের পথ করে দিয়ে বাঙ্গালি যে পাপ করেছে, সেই পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাঙ্গালিকেই করতে হবে। বাঙ্গালির যা কিছু প্রাণসম্পদ আছে, তা দিয়েই বাঙ্গালিকে ভারত স্বাধীন করতে হবে এবং নতুন ভারতের নির্মাণ করতে হবে। এইকাজ একমাত্র বাঙ্গালিই পারবে, এ ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

বাঙ্গালি ন্যায়প্রিয় বলেই তার্কিক, এই ছিল তাঁর মত। বাঙ্গালির নৈতিকতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, '...গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।' আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙ্গালির পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। আমি কিন্তু প্রার্থনা করি, 'বাঙ্গালি যেন চিরকার বাঙ্গালিই থাকে।' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থলে আবার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাঙ্গালি জাতির উদ্দেশে তাঁর ডাক— '...বঙ্গজননী একদল তরুণ নবীন সন্ন্যাসী চান। ...তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের 'রাখি' পরিধান করে মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘোচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্বা ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে।' এহেন প্রণম্য দেশনায়ক তথা বাঙ্গালির চিরকালের আইকন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবছর চলছে। অথচ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় এবারের থিম ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত কলকাতা নরসংহারের নায়ক সুরাবর্দির ডান হাত মুজিবুর রহমান। মনে পড়ে, ২০০৪ সালে বিবিসি পত্রিকার 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি' জরিপে প্রথম হয়েছিলেন মুজিবুর রহমান? শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে বাংলাভাষী আরবেরা আমাদের আইকনের পদ অধিকার করেছে— ওপার বাঙ্গলাতেও আর এপার বাঙ্গলাতেও। জাতি হিসেবে এ আমাদের চরম লজ্জা নয় কী? □

ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থের বলি হয়েছিল প্রাচীন আয়ুর্বেদ

ডঃ নারায়ণ চক্রবর্তী

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আমরা যেমন পৃথিবীর কাছে আমাদের দেশকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে মেলে ধরেছি, তেমনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পকলায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছি। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষতা প্রাচীন যুগে এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, প্লিনি অনুযোগ করেন—আর্যাবর্ত দেশ তাদের কাছে বড়লোক, রাজরাজরাদের ব্যবহারের জন্য মূল্যবান ও বহু দুর্মূল্য সামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করছে! আমরা গুপ্তযুগে নির্মিত যে বিশাল লৌহ মিনারটিকে বানিয়েছিলাম—যেটি কুতুব মিনারের বাগানে ফেলে রাখা আছে, প্রায় দেড়হাজার বছর আগের তৈরি হলেও তাতে একটুও মরচে ধরেনি! ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ঢালাই কারখানাগুলি একশো বছর আগেও এমন মিনার বানানোর কথা কল্পনা করতে পারত না। আমাদের দেশের মসলিন কাপড় বানানোর শিল্পকে ইংরেজ বণিকের দল পশুসুলভ হিংস্রতায় ধ্বংস করেছে। আবার আমাদের নতুনভাবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

আমরা অনেকেই বলে থাকি, ইউরোপ, আমেরিকা চিকিৎসাবিদ্যায়, বিশেষত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় অনেক উন্নত। আমাদের আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র তাদের থেকেই শেখা। এমন একটি মিথ ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। কিছু ডিগ্রিধারী মূর্খ আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি–আয়ুর্বেদ সম্পর্কে না জেনে উন্নাসিকতা দেখাতে গিয়ে এমন ধারণা ব্যক্ত করেন। আমরা যখন কলকাতার ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ক্লাস করতাম, তখন রিজেনারেটিভ মেডিসিনের একজন প্রফেসার ক্লাসে প্রায়শ বলতেন, আধুনিক অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মধ্যে প্রভূত মিল আছে। তিনি আরও বলতেন, সার্জারি এবং অ্যানাটমির ক্ষেত্রে দুটোই এক। তিনি অবশ্য ইউনানি ও হোমিওপ্যাথিকে বিদ্রূপ করতেন।

এবার আসি আয়ুর্বেদশাস্ত্র কীভাবে আমাদের দেশে উৎকর্ষতা লাভ করে এবং আয়ুর্বেদ থেকেই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার উৎপত্তি হলো বলছি কেন তার বিস্তারিত আলোচনায়। ভারতীয় সভ্যতার আদি জ্ঞানভাণ্ডার হলো বেদ। ঋগ্বেদ থেকে আমরা প্রথম জানতে পারি চিকিৎসা শাস্ত্রের দেবতা ধন্বন্তরীর কথা। অথর্ববেদে সার্জারির উল্লেখ পাওয়া গেছে। Xenotransplantation (পশুর অঙ্গ মানুষের দেহে সংস্থাপন)-এর প্রয়োগ করেছিলেন স্বয়ং ধন্বন্তরী অর্থাৎ বিষ্ণু (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী)। ভগবান গণপতি এই প্রতিস্থাপনের প্রথম সফল প্রয়োগ।

অর্ধশিক্ষিত মূর্খরা যুক্তিজাল বিস্তার করে বলতেই পারেন—এসব ইতিহাসের প্রমাণ্য তথ্য নয়। তাদের বলি, পৃথিবীর ইতিহাস কি শুরু হয়েছে যিশুখ্রিস্টের জন্ম বা মহম্মদের মদিনা যাত্রার সময় থেকে কি? ইতিহাস পৃথিবীর জন্মের পরমুহূর্ত থেকে শুরু। কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লিপিবদ্ধ বিবরণ কিন্তু ইতিহাস নয়, প্রচারের হ্যান্ডবিল। যাদের এসব স্বীকার করতে বাধা আছে তাদের বলি, আধুনিক বিশ্ব পৃথিবীর প্রথম চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যাকে তিনি হলেন চরক—তাঁকেই আয়ুর্বেদের জনক বলা হয়েছে। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর রচিত 'চরক সংহিতা' চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। চরক সংহিতা প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত। এতে মোট আটটি বই মিলিয়ে ১২০টি অধ্যায় আছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে চরক সংহিতা কোনো একজন মানুষের রচনা নয়—শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ফসল। বইগুলির বিষয়ে আরও বিশদে আলোচনা করলে বোঝা যাবে, প্রাচীন আয়ুর্বেদের সঙ্গে বর্তমান অ্যালোপ্যাথির তফাত বিশেষ নেই।

চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রাথমিকভাবে দুটি বিভাগ—মেডিসিন ও সার্জারি বা শল্য চিকিৎসা। আমরা একাধিক বেদে সার্জারির উল্লেখ পাই। এই সার্জারির, বিশেষত প্লাস্টিক সার্জারির জনক হিসেবে বিশ্বে যিনি পরিচিত, তিনিও একজন ভারতীয়—সুশ্রুত। প্রমাণ্য নথি থেকে ধারণা করা যায় যে, সুশ্রুতের মৃত্যু হয় ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সুশ্রুতের সুশ্রুত সংহিতায় মোট ১৮৬টি অধ্যায় আছে। যেখানে ১১২০ রকমের অসুখ এবং ৭০০ রকমের মেডিক্যাল প্ল্যান্ট, ৬৪ রকমের আকরিক উৎসের এবং ৫৭ রকমের প্রাণী উৎসজাত ওসুধ তৈরির বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর বইটি মেডিসিন ও সার্জারির শিক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। সুশ্রুত সংহিতায় সার্জারিকে বিশেষ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ছেদ্য (excision), লেখ্য (sacrification), ভেদ্য (puncture), এস্য (exploration), আহর্য (extraction), স্বরায্য (evacuation), এবং সিব্য (suturing)। শুধু ৬০ রকমের ক্ষত সারানোর উপকর্মের কথা লিখেছেন। এমনকী তিনি reconstruction ও প্লাস্টিক সার্জারির কথাও বিশদে লিখেছেন। ৩০০ রকমের বিভিন্ন সার্জারির কথা তিনি লিখেছেন। ১২০ রকমের সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের কথাও তাঁর বইতে পাওয়া যায়। সুশ্রুত সুষ্ঠুভাবে সার্জারির জন্য অ্যানাস্থেসিয়া করার জন্য—মদ henbane (cannabis indica) প্রয়োগের উল্লেখ করেছেন। তিনি কেটে পড়ে যাওয়া নাকের রোগীর নাকের সার্জারি (rhinoplasty) করতেন। এছাড়া ছেঁড়া কান জোড়া দেওয়া (autoplasty) ও ছানি অপারেশান করতেন। এজন্যই তাঁকে প্লাস্টিক সার্জারির জনক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতার সংকলন নেপালের কাইজার লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এটি ১২-১৩ শতাব্দীতে তালপাতার পুঁথিতে লেখা। এখনকার যে চিকিৎসাগুলি আমরা বিদেশ থেকে ধার করি, সেগুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও শল্যচিকিৎসার কথা অনেক আগেই সুশ্রুত লিখে গেছেন। এর মধ্যে আছে রক্তধাতু সঞ্চালন, রসধাতু (lymph), হৃৎসুলা (heart pain), মধুমেহ, স্থূলতা ও উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগের চিকিৎসা। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার কথাও সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখিত আছে। কিডনির পাথর বের করার শল্য চিকিৎসার কথাও এখানে বলা আছে।

যদিও খ্রিস্টপূর্বাব্দে চরকের চিকিৎসার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা নিয়ে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নেই। প্রথমত চরক শব্দের অর্থ 'ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক'। এখানে আরেকটি কথাও অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত—চরক সংহিতার প্রকাশকাল দ্বিতীয় শতাব্দীতে হলেও তা একাধিক মানুষদ্বারা গ্রন্থিত। এই ধারা হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন হিন্দু-চিকিৎসাবিদ্যা, যা আয়ুর্বেদ নামে সারা বিশ্বে পরিচিত, তা কোনও একজন মানুষের রচনা নয়। শতাব্দীর পর

ফ ঃ ২

শতাব্দী ধরে গবেষণা ও চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থিত সংকলন। নিঃসন্দেহে এবিষয়ে প্রথম প্রামাণ্য রচনা চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা। সেই কারণে বেদেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুশ্রুতের মৃত্যু হয়, পরবর্তীকালে আরও অনেকে সুশ্রুত সংহিতায় অধ্যায় সংযোজন করেন। তেমনই আত্রেয় ঋষির তত্ত্বাবধানে অগ্নিবেশ অষ্টম খৃস্টপূর্বাব্দে অগ্নিবেশ সংহিতা রচনা করেন—যার পূর্ণাঙ্গরূপ দেন চরক। জন্ম হয় চরক সংহিতার। চরক সংহিতায় মোট আটটি বই ১২০টি অধ্যায়। এরমধ্যে শেষ দুটি বই কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান এবং সর্বমোট ১৭টি অধ্যায় দৃধবলা সংযোজন করেন।

চরক সংহিতার বইগুলি ও তার অধ্যায়ের কথা জানলে সবাই বুঝতে পারবেন, আমাদের আয়ুর্বেদ আধুনিকরূপে পরিবর্তিত হয়েছে অ্যালোপ্যাথিতে। চরক সংহিতার বইগুলি হল—(১) সূত্রস্থান (৩০টি অধ্যায়)—আলোচ্য বিষয় সাধারণ নীতি, চিকিৎসা দর্শন, স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। (২) নিদানস্থান (৮টি অধ্যায়)---প্যাথোলজি, রোগের কারণ। (৩) বিমনাস্থান (৮টি অধ্যায়)—রোগ নির্দিষ্টকরণ, চিকিৎসকদের ট্রেনিং, নীতিশাস্ত্র (ethics), পথ্য ও ওষুধের স্বাদ। (৪) শারীরস্থান (৮টি অধ্যায়)—শারীরবিদ্যা (anatomy), এমব্রায়োলজি। (৫) ইন্দ্রিয়স্থান (১২টি অধ্যায়)---সংবেদনশীল অঙ্গজনিত পূর্বাভাস---বিশেষত রোগীর সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শনাক্তকরণ। (৬) চিকিৎসাস্থান (৩০টি অধ্যায়)—থেরাপিউটিক্স, রোগের চিকিৎসা ও ওষুধ। (৭) কল্পস্থান (১২টি অধ্যায়)---ওষুধ প্রকরণ বিষয় (pharmaceutics) ও বিষবিদ্যা (toxicology)। (৮) সিদ্ধিস্থান (১২টি অধ্যায়)—চিকিৎসার উৎকর্ষতা, আরোগ্যের লক্ষণ, স্বাস্থ্যবিধি সম্মত সুস্থ জীবনযাত্রা।

এই দুটি সংহিতা বিশদে পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা, যাদের অধিকাংশ ইউরোপ, আমেরিকার অবাক বিস্ময়ে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিকধারার এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এবার আসি আয়ুর্বেদিক ওষুধের সঙ্গে বর্তমানের অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মিল-অমিল বিষয়ে। এ ব্যাপারে প্রথমেই বলি, চিকিৎসাশাস্ত্রে আয়ুর্বেদিক ওষুধের উপকারিতা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অস্বীকার করে না। অল্প কিছু উদাহরণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। অশ্বগন্ধার (withania somnifera) মূলে ক্লান্তি, বেশ কিছু চর্মরোগ, মধুমেহ, গেঁটে বাত (rheumatic arthritis) এবং বেশ কিছু পেটের রোগ-সহ কয়েকপ্রকারের ক্যানসারেরও উপশম হয়। সর্পগন্ধা (raulfia serpentina) উচ্চ রক্তচাপ আয়ত্তে রাখে। নয়নতারা (canthranthus roseus) এখনো ক্যানসারের চিকিৎসায় সারা বিশ্বে ব্যবহার করা হয়। এতে ভিনব্লাস্টিন ও ভিনক্রিস্টিন অ্যালকালয়েড পাওয়া যায়–এই দুটি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার নয়নতারা গাছের মূল-সহ সমস্ত গাছেরই বিষক্রিয়া আছে। অশোধিত মূলে এমন অ্যালকালয়েড পাওয়া যায়, যেমন ভিনডোলিন, যা ক্যানসার কোষের বৃদ্ধির সহায়ক। প্রায় সব আয়ুর্বেদিক ওষুধের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। সে কারণে গাছের কোনো অংশকে সরাসরি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। আয়ুর্বেদে তার জন্য উপযুক্ত 'শোধন'-এর নিদান দেওয়া আছে। তাকে আধুনিক চিকিৎসার পরিভাষায় isolation and purification বলে। এখানেই যত গোলমালের সুযোগ। এই শোধনক্রিয়ার কথা কিন্তু কোথাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা নেই। এর একমাত্র কারণ, ইচ্ছাকৃতভাবে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও ওষুধের বিলুপ্তি ঘটানোর চেষ্টা। আমরা যেসব ওষুধ প্রস্তুতির প্রাচীন ছবি দেখি সেখানে রিটর্ট ও সক্সলেট জাতীয় যন্ত্রপাতি, যা আধুনিক সময়ে ওষুধের isolation and purification-এ ব্যবহার করা হয়, সেসবের উপস্থিতির প্রমাণ পাই। সুতরাং এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাচীনকালে এসবের সাহায্যে এবং ক্রোমাটোগ্রাফির বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে ওষুধের শোধন করা হতো। এতে প্রমাণ হয় যে, প্রাচীনকালে আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি আজকের তথাকথিত বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও ওষুধের উৎকর্ষতায় মোটেও পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু এত উন্নত ও সফল চিকিৎসা পদ্ধতি তার শ্রেষ্ঠত্ব হারালো কেন। এর যথাযথ উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ইতিহাসের পাতা ওলটাতে হবে। ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, যা তখন একমাত্র প্রচলিত চিকিৎসা ছিল, তার সুনাম দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অমলিন ছিল। কিন্তু তারপর, যবন আক্রমণের সময় থেকে এদেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প সমৃদ্ধির অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। যবন আগ্রাসনের সময় থেকে তাদের সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক প্রভাব চিকিৎসাবিদ্যার উপরেও আঘাত হানল। নতুন যবন শাসকরা আয়ুর্বেদের পৃষ্ঠপোষকতা দূরের কথা, তার ধ্বংসসাধনে ব্রতী হলো। তারা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বদলে ইউনানি চিকিৎসায় বিশ্বাস করত। তারা নিজেদের কথাই ভাবত। দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনার কথা জানা যায় না। এই সময় বিস্তর দুর্মূল্য পুঁথিও নথি নষ্ট করে ফেলা হয়। আমার মনে হয়, ওই সময়ই আয়ুর্বেদ চিকিৎসার নথি–বিশেষত শোধনক্রিয়ার বিভিন্ন কলাকৌশল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর ইংরেজ বণিকের দল দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর তাদেরও দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার কোনো চেষ্টা ছিল না। তার কারণ তাদের উন্নাসিকতা। তারা তাদের শিক্ষা থেকে চিকিৎসা সব ক্ষেত্রেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে থাকত।

দুই বিশ্বযুদ্ধ এবং তারপরে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আয়ুর্বেদশাস্ত্র নিয়ে বিদেশে চর্চা শুরু হলে তখন আমাদের দেশের সরকারের টনক নড়ে। আবার সেখানেও গণ্ডগোল। আজকের বিশ্বে সবচেয়ে বেশি টাকার বাণিজ্য করে ওষুধ শিল্প। সুতরাং নথির ভিত্তিতে আয়ুর্বেদকে মান্যতা দিতে বাধ্য হলেও পাশ্চাত্য দুনিয়া তার ওষুধ শিল্পকে মান্যতা দেয় না। তাদের অস্ত্র হলো ওই isolation and purification অর্থাৎ শোধন। আয়ুর্বেদ ওষুধের এই অপূর্ণতাকে আশ্রয় করেই পাশ্চত্যের ওষুধশিল্প তাদের লাভের ব্যবসায় আয়ুর্বেদকে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে না। এ ব্যাপারে অগ্রণী হলো ওষুধ শিল্পের আন্তর্জাতিক কন্ট্রোলার আমেরিকার FDA। এই FDA-র বিরুদ্ধে একাধিকবার সফল লড়াইয়ের ইতিহাস আছে একমাত্র জাপানের। সেজন্য FDA শুধু তাদেরকেই সমীহ করে।

এখন, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আমাদের সরকারের উচিত এ বিষয়ে যথাযথ নজর দেওয়া। আয়ুর্বেদ রিসার্চ ও শোধনে সাম্প্রতিকতম পদ্ধতি অবলম্বন করা, আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে drug efficacy পরীক্ষা করা এবং তার অনুমোদন ও বাজারে আনা। এই পুরো প্রক্রিয়ায় সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে এই আয়ুর্বেদীয় ওষুধের সংযোজন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে এর গুণাগুণ পরীক্ষা করে তা যে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের সমতুল বা উৎকৃষ্টতর তার প্রমাণ রাখার জন্য যথার্থ পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। তারপর কূটনৈতিকভাবে সরকারকে FDA-র উপর চাপ তৈরি করতে হবে এই ভারতীয় পেটেন্টের আয়ুর্বেদীয় ওষুধকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য। আর হ্যাঁ, সরকারের নীতি নির্ধারকদের বিদেশের দালাল ও অর্থশিক্ষিত 'বিশেষজ্ঞ'দের থেকে দূরে থেকে এই মিশনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। দেশ এ কাজে সফল হলে বিশ্বের দরবারে ভারত আবার চিকিৎসা ও প্রযুক্তিতে 'শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গ জৈবপ্রযুক্তি উন্নয়ন নিগমের প্রাক্তন নির্দেশক ও পরামর্শদাতা)

আমাদের দেশ কি সংবিধান নির্দেশিত পথে চলতে পারছে?

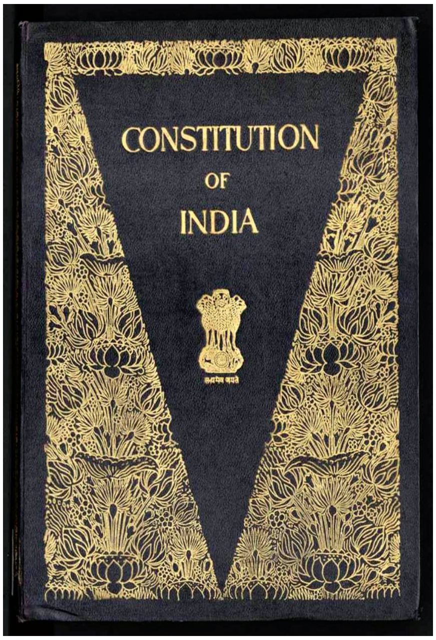

রঞ্জনা মিশ্র

সংবিধানের নির্মাণ মূলত যে ভাবনা থেকে হয়েছিল, ধীরে ধীরে রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে সেই মূলভাবনাকে পিছনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৯ সালের ২৬ জানুয়ারি আমাদের দেশের জনগণ ঠিক করেন যে, এই দিন থেকে আমাদের দেশ সংবিধানের হিসেবে চলবে এবং এই সংবিধান আমাদের নিজস্ব হবে। কোনো 'স্বর্গীয়' ধর্মগ্রন্থ বা কোনো একজন ব্যক্তির মতাদর্শ বা ইচ্ছা অনুসারে এই দেশ চলবে না। সংবিধান যে দেশের সবথেকে পবিত্রতম গ্রন্থ এই কথা দেশের জনমানসে পৌঁছাতে পারেনি। গীতার সার তো আমরা সকলেই জানি, 'কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না', কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কমজনই আছেন যাঁরা সংবিধানের সারমর্ম সম্বন্ধে অবগত। স্বাধীনতা, সাম্য এবং ন্যায় আমাদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। আজকে সবকিছু বদলে গেছে, আজকে রঙেরও বিভাজন হয়ে যাচ্ছে। আজ সবুজ রং মুসলমানদের আর গৈরিক রং হিন্দুদের হয়ে গেছে। খাবারও বিভাজিত, আজ বিরিয়ানি মুসলমানদের আর খিচুড়ি হিন্দুদের খাবার। আজ আমরা পশুপাখিকেও ধর্মের ভিত্তিতে দেখতে শুরু করেছি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ার পর সংবিধান নির্মাতারা ভেবেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। যারা বলছেন এই বিষয়টি এখন তৈরি হয়েছে, বস্তুত এই হলো সেই বিষয় যার কারণে দেশ ভাগ হয়েছে। ভাবার বিষয় হলো, এই বিষয়ের কতটা গুরুত্ব ছিল যে যার ফলস্বরূপ দেশ ভেঙে গিয়েছে। আমাদের সংবিধানের নির্মাতারা ভেবেছিলেন, ভারতের মুসলমান জনগণ ও তাদের নেতাদের একটি পৃথক ভূমি দেশ হিসেবে প্রদান করলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। কিন্তু পৃথক পাকিস্তানের পরও ভারত ও ভারতীয় রাজনৈতিক মহল থেকে বিষয়টি পৃথক হতে পারেনি। ভারত ভেঙে পাকিস্তান হওয়ার পরও পাকিস্তান তার রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার জন্য আজও আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। এরফলে দেশের মানুষ ক্রমাগতভাবে বিভক্ত হতে থাকল, যে কারণে আজও আমাদের সমাজে একাত্মবোধের অভাব অনুভূত হয়। যদি কোনো ব্যক্তিকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা দেওয়া হয় তবে সে হয়তো সেটিকে মাথায় ঠেকাবে কিন্তু তাকেই যদি সংবিধান দেওয়া হয় সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবে যে সে বইটি নিয়ে কী করবে? তাকে বইটি দেওয়া হলো কেন? বস্তুত আমরা এক রাষ্ট্র হিসেবে সংবিধানের শাসনকে গীতার মতো তুলে ধরতে পারিনি। দেশের সবথেকে দুর্বল মানুষের জীবনে আজও সংবিধানের প্রভাব পৌঁছাতে পারেনি। আমরা আদালতে গীতার ওপর হাত রেখে শপথ করে সত্য বলি কিন্তু সংবিধানের প্রতি সেই ধারণা তৈরি করতে পারিনি।

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধান স্বীকৃত হওয়ার পর বিশেষ ধরনের কাগজের

যে সকল ভাবনাচিন্তা নিয়ে সংবিধানের নির্মাতাগণ সংবিধান রচনা করেছিলেন, সেই সকল ভাবনা আজ অনেক পেছনে রয়ে গেছে। এখন সংবিধানকে নিজের নিজের সুবিধা মতো ব্যবহার করা হয়

ওপর হাতে লিখে বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই বিশেষ কাগজের আয়ু ১০০০ বছর। অর্থাৎ ১০০০ বছর পর্যন্ত আমাদের সংবিধানের মূল কপি সুরক্ষিত থাকবে। ২৫১ পাতার এই সংবিধান প্রায় ৪ কেজি ওজনের। ১৯৫০ সালে সংবিধান সভার ২৯২ জন প্রতিনিধি সংবিধানের এই কপিতেই হস্তাক্ষর করেছিলেন।

সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর। সংবিধানের সংকলনের জন্য মোট ১১টি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনগুলিতে মোট ৫৩ হাজার মানুষ সংযুক্ত ছিলেন। সংবিধান সভায় পাশ হতে মোট ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন সময় লেগেছিল। সংবিধানের খসড়া তৈরি করার জন্য সভার উপদেষ্টা বি.এন. রাওয়ের পরামর্শে ৪০টি দেশের সংবিধান অধ্যয়ন করা হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বিশ্বের ক্ষুদ্রতম লিখিত সংবিধান, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান যা আমেরিকার সংবিধানের ৫ গুণ বড়ো। আমাদের দেশের নেতারা সংবিধানের বিষয়ে কোনো কথা বলেন না এবং দেশের জনগণকেও সেভাবে সচেতন করতে পারেননি। এই কারণে আমাদের দেশের জনগণ সংবিধান সম্পর্কে এত কম অবগত। এই অজ্ঞানতার প্রমাণ ২০১০ সালে পাওয়া যায়। সংবিধান প্রযোজ্য হওয়ার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গুজরাটের সুরেন্দ্রনগরে সংবিধান গৌরব যাত্রায় আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

সংবিধানের একটি বড়ো কাটআউট নিয়ে যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। এই গৌরব যাত্রার তুলনা একজন জৈন বিদ্বান আচার্য হেমচন্দ্রাচার্যকে প্রদান করা সম্মানের সঙ্গে করা হয়। তিনি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের ওপর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন যার নাম 'সিদ্ধহেমচন্দ্র শব্দানুশাসন'। এই পুস্তকটি নিয়ে ৯০০ বছর আগে গুজরাটের রাজা সিদ্ধরাজ পাটন শহর থেকে খুব ধুমধামের সঙ্গে হাতির পিঠে চাপিয়ে এক ভব্য শোভাযাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ জনমানসে আজও সংবিধান সম্পর্কে সচেতন করার প্রচেষ্টা সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গান্ধীজীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি সংবিধানের মধ্যে কী কী আশা করেন, তখন তিনি সংবিধান সভার সদস্যদের জানান 'আমি তোমাদের একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, একজন গরিব মানুষের মুখ মনে করো, এবার নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করো যে কী পদক্ষেপ নিলে এই ব্যক্তির জন্য সবথেকে উপযোগী হবে।' গান্ধীজীর এই ভাবনা থেকে স্পষ্ট ছিল যে তিনি চেয়েছিলেন, সংবিধান সকলকে সমান চোখে দেখুক। এই চেষ্টাও করা হয়েছিল। কিন্তু পরে সংবিধানে ধারা ৩৭০ এবং সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলিকে সংযুক্ত করা হয় যেগুলি দেশের একতার ভাবনাকে খণ্ডিত করেছিল।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে আর্টিকেল ৩০৬-এর ওপর চর্চা করা হয়েছিল। পরে তার নাম পরিবর্তন করে আর্টিকেল ৩৭০ হয়। গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এই আর্টিকেলের খসড়া তৈরি করেন। তাঁকে জওহরলাল নেহরুর খুব কাছের লোকেদের মধ্যে ধরা হতো। ৩৭০ ধারাতে কাশ্মীরকে একটি বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা হসরত মোহানি একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই ভেদাভেদ কেন করা হচ্ছে? এর উত্তরে শ্রী আয়েঙ্গার বলেন, জম্মু-কাশ্মীর বাকি রাজ্যগুলির মতো ভারতের অংশ হিসেবে যোগদান করতে প্রস্তুত নয়, যে কারণে এই ভেদাভেদ করা হচ্ছে। যদি তৎকালীন সংবিধান সভা জম্মু কাশ্মীরকে বিশেষ অধিকার না দিয়ে থাকত, তাহলে আজকে জম্মু-কাশ্মীরকে নিয়ে এত সমস্যাই তৈরি হতো না। একই ভাবে সংবিধান সভায় সংরক্ষণ নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের মে মাসে এই আলোচনা চলাকালীন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন, 'আমার ইচ্ছা, আমরা এমন এক সমাজের সূচনা করি যেখানে সকল ভারতীয়ের জন্য সমান অধিকার থাকবে, এই সমাজে জাতীয় নিরিখে সংরক্ষণ করার কোনো প্রয়োজন হবে না।' এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের মে মাসে সংবিধান সভার আরও অনেক সদস্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন যে জাতীয় অধিকারে সংরক্ষণ থাকা উচিত হবে না। সংরক্ষণের পক্ষে সব থেকে বেশি আওয়াজ তোলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর। তিনি দাবি রাখেন যে সংরক্ষণের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় এমন কিছু মানুষ আসতে পারবেন যারা এতদিন প্রশাসনের বাইরে ছিলেন। যদিও তিনি সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এই ব্যবস্থাকে প্রতি ১০ বছর অন্তর মূল্যায়ন করা হোক এবং প্রয়োজন সম্পূর্ণ হলে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হোক। কিন্তু এই ব্যবস্থা কোনোদিনই বন্ধ করা সম্ভব হয়নি আর হবেও না। কারণ, এই সংরক্ষণই ভোটে জেতার ফর্মূলাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রতি ৫ বছর অন্তর সরকারের এটা বলা দরকার ছিল যে কীভাবে পর্যায়ক্রমিক ভাবে সংরক্ষণের আওতায় থাকা মানুষদের সংখ্যা কমে আসছে এবং তাদের এটা লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল যাতে এই সংরক্ষণের কোনো প্রয়োজনই না থাকে। কিন্তু প্রতি ৫ বছরে আমাদের সরকার সংরক্ষণের পরিসীমার মধ্যে আরও বেশি মানুষকে নিয়ে আসছে। স্বাধীনতার ৭৪ বছর পর এমন পরিস্থিতি আসা প্রয়োজন ছিল যে সরকার বলতে পারত যে আমাদের দেশে এখন এমন একজন ব্যক্তিও অবশিষ্ট নেই যার সংরক্ষণের প্রয়োজন। বস্তুত যে সকল ভাবনাচিন্তা নিয়ে সংবিধানের নির্মাতাগণ সংবিধান রচনা করেছিলেন, সেই সকল ভাবনা আজ অনেক পেছনে রয়ে গেছে। এখন সংবিধানকে নিজের নিজের সুবিধা মতো ব্যবহার করা হয়। আজও আমাদের দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার মতো অভিশাপ নির্মূল হয়নি। বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারের ভুল প্রয়োগ হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাও নিজেদের সুবিধামতো করে নেওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্র ক্রমাগত ভাবে ভিড়তন্ত্রে পরিণত হচ্ছে আর দেশের কিছু ব্যক্তি বাকিদের অধিকার হনন করছে। এইসব দেখে একজন সাধারণ নাগরিকের মনে এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে, আমাদের দেশের সংবিধান কী আজও সঠিক? আমরা কি তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারছি, আর আমাদের দেশ কি সংবিধান নির্দেশিত পথে চলতে পারছে?

(লেখিকা একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ)

আইএএস, আইপিএস অফিসারেরা অসভ্যতা-বর্বরতার নজির স্থাপন করছেন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও রাজ্য পুলিশের ডিজির ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'রাজ্যপালকে বয়কট করেছেন মুখ্যসচিব ও ডিজিপি। একাধিকবার তলব করার পরও তাঁরা সাড়া দিচ্ছেন না। এটি অমার্জনীয় সাংবিধানিক গাফিলতি।'

ভিডিয়ো পোস্টে রাজ্যপাল বলেন, 'বারবার তলব সত্ত্বেও মুখ্যসচিব ও ডিজির রাজভবন 'বয়কট' একটি 'কনস্টিটিউশনাল ল্যাপস।' অর্থাৎ সাংবিধানিক ত্রুটি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে ১০ জানুয়ারিও মুখ্যসচিব ও রাজ্যপুলিশের ডিজির কাছে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন রাজ্যপাল। সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছিলেন, 'কার নির্দেশে বয়কট?'

রাজ্যপাল আবারও বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে তা বোঝার জন্য এই একটা উদাহরণ যথেষ্ট।' তিনি লিখেছেন, 'রাজ্যপালের ডাকা বৈঠক বয়কট করেন মুখ্যসচিব ও ডিজি। তিনদিনে দু'বার এমনটা ঘটেছে। এটি পদক্ষেপযোগ্য ও ক্ষমার অযোগ্য সাংবিধানিক ত্রুটি। এই সাংবিধানিক ত্রুটি রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা করেছেন।'

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাইয়ে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরও কেন পুলিশ বাধা দিল, তা জানতে চেয়ে মুখ্যসচিব ও পুলিশের ডিজিকে তলব করেন রাজ্যপাল। কিন্তু মুখ্যসচিব বা ডিজি কেউ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেননি।

সংবাদপত্রে এই খবর পড়ার পর মনে হচ্ছে রাজ্যের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং

সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য শাসন করলেও রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হলেও রাজ্যপালকে উপেক্ষা করা বা রাজ্যপালের আহ্বানে সাড়া না দেওয়া সংবিধানকেই অপমান করার শামিল।

শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কে কত বেশি অসভ্যতা ও অভব্যতার নজির রেখে যেতে পারেন। ২০১১ সালের পর থেকে কতকগুলো ঘটনা বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে। একটু পিছন ফিরে যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে, পুলিশ সাধারণ এক অপরাধীকে ধরে নিয়ে গেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন নিজে থানায় গিয়ে জোর করে অপরাধীকে থানা থেকে নিয়ে আসতে পারেন তখন মানতেই হবে অরাজকতার শুভাগমন শুরু হলো। পরে আরও দেখা গেছে, কোনো ধর্ষককে ধরলে পুলিশ অফিসারকে শাস্তি পেতে হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়ক নামের লুটেরারদের ধরলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যখন তার বিরুদ্ধাচারণ করে অবরোধে নেতৃত্ব দেন তখন বুঝতে হবে রাজ্যে একমাত্র লুটেরা ও চোরেরাই গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করছে।

মুখ্যসচিব, ডিজি বা আর যে সমস্ত আইএএস, আইপিএস অফিসার রয়েছেন তাঁরা কিন্তু প্রত্যেকেই অত্যন্ত উজ্জ্বল মেধাসম্পন্ন এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ আধিকারিক। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব মেধা, পাণ্ডিত্য এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্যই ওই সমস্ত পদে যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। তাঁরা নিজেরাও জানেন তাঁদের পদের সম্মান কত উঁচুতে। এবং তাঁরা কারও বা কোনও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর হাতের পুতুল নন বা তাঁরা রাজনীতির লোক নন। তাঁরা সরকারি আধিকারিক এবং সর্বৈবভাবে নিরপেক্ষ। তবুও যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তাঁরা সেই দলের কেষ্ট-বিষ্টুদের অঙ্গুলি হেলনে নড়াচড়া করেন। যদি তাঁরা তা না করেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে সরকারি দলের করণীয় কিছু নেই।

যে কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রতিনিধি। সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য শাসন করলেও রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হলেও রাজ্যপালকে উপেক্ষা করা বা রাজ্যপালের আহ্বানে সাড়া না দেওয়া সংবিধানকেই অপমান করার শামিল। সাম্প্রতিক অতীতে আমরা দেখেছি, প্রাক্তন মুখ্যসচিব এরকম বেয়াড়াপনা করায় কেন্দ্র সরকার তাকে ভর্ৎসনা করেছিল। কেন্দ্রের কানমলা খাওয়ার পরই অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতি সদয় হয়ে সেই মুখ্যসচিবকে আরও বেশি বেতনে বিনে কাজে নৈবেদ্যর উপর ক্ষীরের নাড়ুর মতো বসিয়ে

রেখেছেন। তাতে মুখ্যসচিবের রোজগার বেশি হলেও কেন্দ্রের ভর্ৎসনার রেশ এখনও শেষ হয়নি। যখন শেষ হবে তখন বোঝা যাবে কার শক্তি কতটুকু।

যে সমস্ত আইপিএস অফিসার রাজ্যপালকে উপেক্ষা করছেন তাঁরা কিন্তু জানেন যে শাসকদলের নেতা এবং তাদের প্রতিপালিত গুন্ডাদের হাতে কিল, চড়, লাথি খেয়ে বা খাওয়ার ভয়ে কখনও টেবিলের তলায়, কখনও আলমারির ফাঁকে, কখনও-বা 'কভার ফাইল' মাথার সামনে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেন থানার পুলিশ অফিসারেরা। তখন কিন্তু ডিজি তাঁরই অধস্তন ওই অফিসারদের সম্মান রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন না। এ বড়ো লজ্জার কথা, এ লজ্জা সমগ্র পুলিশ বিভাগের, এ লজ্জা রাজ্যেরও বটে! পুলিশের এত অবনতি হয় কী করে সেটা ভাবতেও সাধারণ নাগরিকরা লজ্জিত হন। ডিজিপি তাঁর মেধা, পাণ্ডিত্য ও কর্মক্ষমতার কারণে যোগ্যস্থান লাভ করেছেন। কিন্তু এত উচ্চস্থানে উঠেও তিনি কারও কারও চাটুকারিতা করতে বাধ্য হচ্ছেন শুধু তাঁর প্রাপ্তিযোগের জন্য নিজ মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিয়ে। অথচ তাঁর চেয়ে অধস্তন কয়েকজন পুলিশ অফিসার নিজের মেরুদণ্ড সোজা রেখে এরাজ্যে যে নজির রেখে গেছেন তা বর্তমান ডিজি-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের জেনে রাখা ভালো।

১। ১৯৪৬ সালে কলকাতার হিন্দু নিধনের ঘটনা ছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) নরপিশাচ সোরাবর্দির মস্তিস্কপ্রসূত। তার নির্দেশে মুসলমান গুন্ডারা হিন্দু হত্যা শুরু করলে কলকাতার ডিসি ডিডি হীরেন সরকার গাড়িভর্তি গোর্খা আর্মড ফোর্স নিয়ে মুসলমান অধ্যুষিত খিদিরপুরে গিয়ে তাঁর পুলিশ বাহিনীকে 'shoot to kill' নির্দেশ দেন এবং দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে হিন্দুদের উদ্ধার করে ভবানীপুরে নিরাপদ স্থানে রেখে কন্ট্রোলরুমে ফিরে আসতেই ক্রুদ্ধ সোরাবর্দি হীরেন সরকারকে বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিনা নির্দেশে তিনি কেন খিদিরপুর গিয়েছিলেন?' ততোধিক জোরে হীরেন সরকার বলেছিলেন, 'পুলিশ আইনে নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় তিনি দায়বদ্ধ। সুতরাং ওই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন মাত্র।' সোরাবর্দি আর কোনো প্রশ্ন না করে চলে গিয়েছিলেন।

২। ১৯৬৯ সালে মালদহ জেলার গাজোল থানার একটি গ্রামে জমির ফসলের ভাগ নিয়ে ভাগচাষিরা জমির মালিকের বাড়িতে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে অগ্নিসংযোগ, দু'জন মহিলাকে ধর্ষণ এবং এক মহিলা-সহ তিনজনকে হত্যা করে। ঘটনার পর গাজোল থানার তৎকালীন বড়োবাবু মিহিরেশ বর্মন ঘটনাস্থলে যান এবং ধর্ষণ, খুন ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনার খবর তৎকালীন পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানতে পেরে সরাসরি ওসি মিহিরেশ বর্মনকে ফোন করে থানা থেকে জামিনে ওই চারজনকে ছেড়ে দিতে বলেন। উত্তরে মিহিরেশবাবু জ্যোতিবাবুকে জানান যে, যে অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাতে থানা থেকে জামিন দেওয়া যায় না। এর কিছুক্ষণ পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তৎকালীন জয়েন্ট সেক্রেটারি মোস্তাক মুর্শেদকে দিয়ে বড়োবাবুকে নির্দেশ পাঠান যে, পুলিশ যেন আদালতে অভিযুক্তদের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা না করে। কিন্তু বড়োবাবু সেই নির্দেশটিও আইনগত কারণে তামিল করতে অস্বীকার করেন। এর কয়েকদিন পরে বড়োবাবু মিহিরেশ বর্মনকে দ্রুত বদলির নির্দেশ দেন মালদহের পুলিশ সুপার। মিহিরেশবাবু বদলির নির্দেশ পেয়ে হাইকোর্টে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় খবরের কাগজে খবরটি পড়ে মালদহ সফরে আসেন এবং মিহিরেশবাবুকে ডেকে পাঠান। অজয়বাবু ঘটনার পুরো সরকারি ফাইলটি দেখে মালদহের পুলিশ সুপারকে মিহিরেশবাবুর বদলির আদেশ বাতিলের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজে ওই ফাইলে সই করেন। পরবর্তীতে মিহিরেশবাবু সিনিয়র অফিসারদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন।

৩। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে জ্যোতি বসু পুলিশমন্ত্রী ছিলেন আর পুলিশের শীর্ষকর্তা ছিলেন উপানন্দবাবু। ঠিক এখনকার মতো তখনও পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক হানাহানিতে রক্তাক্ত। আসানসোলের কোলিয়াড়ির এক শ্রমিক নেতার খুনের ঘটনায় সিপিএমের কয়েকজন ক্যাডার গ্রেপ্তার হলে ক্ষিপ্ত জ্যোতিবাবু উপানন্দবাবুকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী ব্যাপার! পুলিশ আমাদের লোকজনকে ধরছে কেন?' পুলিশকর্তা জবাবে জ্যোতিবাবুর মুখের ওপর বলেছিলেন, 'ধৃতদের নাম এফআইআর-এ আছে। পুলিশ সঠিক কাজই করেছে।' জ্যোতিবাবু পালটা কোনো প্রশ্ন করেননি।

উপরে বর্ণিত পুলিশ অফিসারেরা কোনোদিন উপরি পাওয়ার লোভে মেরুদণ্ডকে বাঁকা হতে দেননি। এইখানেই তখনকার আর এখনকার আধিকারিকদের মধ্যে তফাত। বর্তমান পুলিশ অফিসার বা মুখ্যসচিব যদি মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ মন্ত্রীর এরকম প্রশ্নের সামনে পড়েন তাহলে যে ভয়ে তাঁদের পোশাক নোংরা হয়ে যাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু রাজ্যে যত গুন্ডা-সন্ত্রাসী সরকারি ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত হচ্ছে তাদের রাজ্যপাল প্রতিপালন করেন না। করেন তিনি 'গুন্ডা কন্ট্রোল করেন' যিনি। কাজেই সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল হলেও তার সঙ্গে উচ্চ আধিকারিকদের অসভ্যতা-বর্বরতা করাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যিনি গুন্ডা কন্ট্রোল করেন তাঁর কথা শুনতেই হবে, নচেৎ অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে বোমার আঘাতে তাঁর গাড়িটি জ্বলে যেতে পারে অথবা বাড়ি গিয়ে দেখতে হতে পারে তাঁর স্ত্রী-কন্যা বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে। রাজ্যে দুধেল গোরুরা আছে না?

এহেন পরিস্থিতিতে রাজ্যের উচ্চ আধিকারিকরা যদি সংবিধান মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে রাজ্যপালকে উপেক্ষা না করে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন তাহলে একদিকে যেমন শাসকদল তাঁদের বিপথে চালিত করতে পারবে না, তেমনি অন্যদিকে আমজনতার আশীর্বাদ তাঁদের মাথায় বর্ষিত হবে। হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও কারও চটি চেটে পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীকে যেতে না দেওয়াতে শুভেন্দুর কী ক্ষতি করতে পেরেছে জানা না গেলেও যেটা জানা গেল তা হলো পুলিশ সংবিধান এবং হাইকোর্টকে অবমাননা করেছে এটা নিশ্চিত। কে বলতে পারে যে আগামীদিনে এই মুখ্যসচিব ও ডিজিপি-কে সেই অপমানিত রাজ্যপাল এবং হাইকোর্টের দারস্থ হতে হবে না? □

সবকিছুই তো চলছে, শিক্ষার দ্বার বন্ধ কেন?

বরুণ মণ্ডল

দেশ বা রাজ্যে সবকিছুই চলছে কিন্তু শিক্ষার দ্বার বন্ধ। সব কিছু বলতে— মেলা চলছে, খেলা চলছে, বিনোদনের সিনেমা হল চলছে। করোনাকে উপেক্ষা করেই রাজনৈতিক জমায়েত, প্রচার, ভোটগ্রহণ চলছে। বন্ধ শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র। সত্যিই কি শিক্ষা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার সেই ছেলেটিকে আবার ফিরিয়ে আনবে যে বলবে 'রাজা তোর কাপড় কোথায়?' সেই ভয়েই কি শিক্ষার দ্বার চক্রান্ত করে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে? সত্যিই এই প্রশ্নটা আজ শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয়, সমাজের অলিতে গলিতে উঠতে শুরু করেছে।

আপনি বলবেন, শিক্ষার দ্বার বন্ধ, কিন্তু সত্যিই কি শিক্ষার দ্বার পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে? তাহলে আধুনিক শিক্ষাদাতা মোবাইল অ্যাপস যেমন বাইজুস, টিউটোপিয়া ইত্যাদি কোটি কোটি টাকা বিজ্ঞাপন খরচ করে লাভের মুখ দেখছে কীভাবে এই অতিমারীর কালেও! কলকাতা শহরের বিলবোর্ডগুলি এবং দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ঝাঁ-চকচকে বিজ্ঞাপনের দখলে চলে গেছে। এই করোনা অতিমারীর অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যেও ক্রিকেটারদের কোটি কোটি টাকা স্পনসর করছে বাইজুস। বিজ্ঞাপন প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে 'হোয়াইট হ্যাট জুনিয়র' দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তারাই শিক্ষার দ্বার আরও উন্মুক্ত করে রেখেছে। কিন্তু তাদের সাজানো-গোছানো শিক্ষাঙ্গনের দরজায় মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের শিক্ষা প্রার্থী সন্তানেরা প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ সেখানে দস্তুরমতো উচ্চ মূল্যে শিক্ষা ক্রয় করতে হয়। আর নতুন নতুন অদৃশ্য রোগের আতঙ্কে কাজ হারিয়ে শিক্ষাকে 'অবাঞ্ছিত এবং বড়োলোকের বিনোদন' মনে করে ফ্রিতে দেওয়া চাল-গমের লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে আপামর জনতা। আজ আবার প্রান্তিক মানুষের কাছে 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

একবার তথ্যের অধিকার প্রয়োগ করে দেখুন, বাইজুস, হোয়াইট হ্যাট জুনিয়র এবং টিউটোপিয়ার মতো শিক্ষা-বণিকদের হাত কতদূর লম্বা যেখানে ফ্রিতে সরকারি শিক্ষা দেওয়ার অঙ্গনগুলিতে ধুলো পড়ে 'হন্টেড হাউস' হয়ে উঠেছে; শিক্ষাকে যেখানে 'বড়লোকের বিনোদন' বানিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে (অর্থাৎ স্কুলগুলিকে) ফ্রির রেশন দোকান বানিয়ে ছাড়া হয়েছে, সেখানে 'টিউটোপিয়া অ্যাপ' উদ্বোধনে রাজ্যের তথাকথিত শিক্ষিত মহল (যাদেরকে 'বুদ্ধিজীবী' বলে পরিচয় করানো হয়) এবং শিক্ষার সঙ্গে জড়িত মন্ত্রীরাও চাঁদেরহাট বানিয়েছেন! এই অ্যাপে পড়াশোনা করলে আপনার সন্তান কতটা উপকৃত হবে তা নিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়িক উন্নয়ন ঘটাতে 'অনুপ্রেরণা' দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারবাবু, পরিসংখ্যান সংস্থা এবং সংবাদ মিডিয়া গোয়েবলসীয় সূত্রকে অবলম্বন করে জনতার মস্তিষ্কে অসত্য, অর্ধসত্য এবং বিকৃত তথ্যের জাল বিছিয়ে 'অদৃশ্য আতঙ্ক' সৃষ্টি করছেন। সেই সমস্ত ডাক্তারবাবু এবং পরিসংখ্যান সংস্থার স্বার্থটা আনুমানিক হলেও আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর মতো মিডিয়ার স্বার্থটা পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন দেখি টিউটোপিয়া অ্যাপটির ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবিপি গ্রুপের অটুট বন্ধনে জড়িত। কোথায় যেন করোনা আতঙ্ককে হাতিয়ার করে শিক্ষাক্ষেত্র ও ইন্টারনেট পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে। আর যুদ্ধ মানেই, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়!' সুতরাং সাধারণ জনতা অর্থাৎ উলুখাগড়াগুলির ভবিষ্যৎ ভয়ংকর অন্ধকারে ঢেকে আসছে। এখন প্রশ্ন হলো, সাধারণ জনতার এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কী করা উচিত? গণতন্ত্রে শক্তির উৎস জনতা। আর সেই জনতাকেই বোকা বানিয়েতাদের উপরেই ছড়ি ঘোরানো হচ্ছে। জনতার একমাত্র অস্ত্র আন্দোলন। কিন্তু সমস্ত রকম জমায়েত চললেও বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে জমায়েত চলবে না; কারণ তখন যে 'করোনা ছড়াবে'; শিক্ষা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রশাসনের আর্থিক লভ্যাংশের যোগাযোগ না থাকলেও প্রশাসন জমায়েতের উপর লাঠিচার্জ করবেই! তাই এই আন্দোলনের একমাত্র উপায় শিক্ষা অ্যাপগুলি এড়িয়ে গিয়ে বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করা। মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত না হয়ে এবং সুন্দর ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায় লুব্ধ না হয়ে না হয়ে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় অনড় থাকতে হবে।

সরকারি শিক্ষক সমাজকে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তারা যদি ভেবে থাকেন অন্যান্যদের মতো করোনা আতঙ্কে ঢাল করে নামমাত্র পরিশ্রম করে পূর্ণ মাত্রায় লভ্যাংশ ঘরে তুলতে থাকবেন তবে মহা ভুল করবেন। বিএসএনএল কর্মীরাও ঠিক এই ভুলটি করেছিলেন। কথায় আছে, যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি খেতে হয়; কিন্তু আমি বলব 'যে গোরু দুধ দেয় তার যত্ন আগে নিতে হয়।' পরিকল্পনামাফিক সরকারি স্কুল কলেজগুলকে অপাংক্তেয় করে ফেলতে পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি সরকারের মনোভাব বদলাতে বাধ্য। তাই, অতিত থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার অঙ্গনে এই কালো মেঘ সরাতে শিক্ষক সমাজকেও অভিভাবকদের নিজেদের স্বার্থে এবং শিক্ষিত শ্রেণীকে সমাজের স্বার্থে সবার আগে এই আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। □

বিশেষ প্রতিবেদন

জৈব গ্যাসের ব্যবহারে কমবে অপরিশোধিত তেলের আমদানি

শেখর সেনগুপ্ত

শহুরে বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে বাক্যালাপের পর আমি বুঝেছি, জৈব গ্যাসকে নিয়ে মাথা ঘামাতে তাঁরা কেবল নারাজ নন, বিষয়টা তাঁদের কাছে মোটামুটি এক ধরনের পাগলামি মাত্র। অথচ এটা যে আমাদের দেশে কতবড়ো শক্তির উৎস হয়ে উঠতে পারে, কেন্দ্রের সরকার তা যথাযথভাবে অবহিত এবং আলাদা ধাতু দিয়ে গড়া প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ে একাধিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর। এখন কিন্তু সময় হয়েছে প্রত্যেক মানুষের বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাবার। সরকারি বয়ানে প্রতিফলিত হয়েছে এই তথ্য যে, ভারতে প্রতিদিন ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ১ শত ২৮ টন বর্জ্য তৈরি হয়, যাদের শক্তি উৎপাদনের কর্মসূচির অন্তর্গত করতে পারলে আমাদের দেশ আক্ষরিক অর্থেই আরও সুস্থিত সম্পন্নতা অর্জন করবে। শহর, শহরতলি, শিল্পাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে স্তূপীকৃত বর্জ্য থেকে জৈব গ্যাসের পাশাপাশি প্রভূত বিদ্যুৎ উৎপাদনও এসে থাকে আমাদের আয়ত্তে। বর্তমানে কেন্দ্রের সরকার এই বিষয়টার তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন; তাই ঘটেছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও। বৃহদাকার জৈবগ্যাস উৎপাদনের রূপরেখা তৈরি করেছেন বর্তমান সরকার। ইতিমধ্যে বেসরকারি উদ্যোগে কৃষিজ বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের সংস্থা গড়ে উঠেছে মোট ২০৩টি, যাদের উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ ৩৮৫.২৯ মেগাওয়াট। তাই বর্জ্যকে উড়নচণ্ডীর মতো ধ্বংস না করে শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করবার কাজে নেমে পড়েছেন বর্তমান সরকার এবং তাঁরা দেশের একাধিক বিশেষজ্ঞের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইছেন।

এই প্রসঙ্গে জানাই, এক দশকেরও আগে আমাদের দেশে সরকারি মদতে গঠিত হয়েছে 'জৈবগ্যাস অ্যাসোসিয়েশন'— যা সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং এই সংস্থারই উদ্যোগে রীতিমতো গবেষণা চলছে জৈব গ্যাস নিয়ে। গবেষণার কাজে তাদের সহায়ক প্রতিষ্ঠানের নাম Sambcrop Energy India Ltd. এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত একটি রিপোর্ট আমার হাতে আসে। সেই রিপোর্টে কোনও অলীক স্বপ্ন, চটুল চপলতা নেই। পরিবর্তে বাস্তবকেই যেন গুঁতো মেরে সামনে এনে ফেলা হয়েছে যে ভাষায়, তার বাংলা রূপান্তর এই প্রকার :

'...ভারতের বহু গ্রামীণ এলাকায় জৈব গ্যাস ব্যবহারের উদ্যম দেখা গেলেও শহরাঞ্চলের উদ্যোগপতিরা এই বিষয়টিতে অদ্যপি বহুলাংশে নিস্পৃহ। তাঁদের মুনাফাচর্চিত রঙিন মানচিত্রে বাহারি শাড়ি তৈরির স্থান থাকতে পারে; কিন্তু জৈব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ছায়াঘেরা বসতিগুলিকে আলোকিত করবার কোনও পরিকল্পনা আমাদের জরিপে এ যাবৎ ধরা পড়েনি।' দুনিয়ার বেশিরভাগ উন্নত দেশের রসকষহীন সমীক্ষায় চোখ রাখলে আমাদের চেতনা কিন্তু ভিন্নমুখী হতে বাধ্য। সেখানে পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায় বর্জ্যবস্তুগুলি। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে মুক্তিলাভ তো সর্বজনবিদিত, সেই সঙ্গে রয়েছে বর্জ্যকে সম্পদরূপে ব্যবহার করে জনসমুদ্রে বিবিধ উন্নয়নের বাস্তবায়ন। আমরাও কিন্তু তদ্রূপ সুকর্ম করতে পারি বিজ্ঞানের অঙ্গনে ঘোরাফেরা বাড়িয়ে দিয়ে। তেতো বিরক্তির সঙ্গে যাঁরা বর্জ্যকে পাহাড়প্রমাণ করে তোলেন, সামাজিক ও আর্থিক মানদণ্ডে তারা কিন্তু এক একজন দুর্বৃত্ত। মনে রাখবেন, জৈব পদার্থ থেকে প্রভূত জ্বালানি উৎপাদন সম্ভব। বেরিয়ে আসবে এমন জলীয় পদার্থ, যা চাষাবাদে ব্যবহৃত হতে পারবে নির্দ্বিধায়। Composed Bio Gas (CBG) অর্থাৎ সংনমিত জৈব গ্যাসের গুরুত্ব বিশ্বের প্রতিটি দেশে দ্রুত বর্ধমান।

এই গ্যাসের উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাবে, ততই সুলভ হবে যানবাহনের পরিষেবা। হ্রাস পাবে অপরিশোধিত তেলের আমদানি। এই সময়ে সচেতন সরকারের সহায়তায় ভারতে বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপাদিত সিবিজি-র পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টন বছরে, নিকট ভবিষ্যতে যা পৌঁছে যেতে পারে দশ লক্ষ টনে। প্রশ্ন, কোথা থেকে আসবে ওই পর্বতপ্রমাণ সিবিজি?

এর উত্তর হলো, সেই মহার্ঘ উপাদনের সংখ্যা ও পরিমাণ বিস্তর, প্রায় সীমাহীন। পচা আলু, আখের ছিবড়ে, বিনষ্ট শাকসবজি, ভাতের ফেন, গোরু-মোষের গোবর, ছাগলের লাদি, পশুপাখির গলিত মৃতদেহ, বিসর্জিত বা বর্জিত খাদ্যসামগ্রী, হাঁস-মুরগির খামার, গাছগাছালির ঝরাপাতা, কলকারখানার বর্জ্য ইত্যাদি অপরিমিতদের সাত-সতেরো। আমাদের দেশে এই সবের অভাব তো কোনও কালেই ছিল না, এখনও নেই। এরাই যে অপ্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের জীবনযাত্রায় মুখের হাসি সৃষ্টি করতে পারে, তা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি উন্নত ও অনুন্নত দেশে নির্ভেজাল সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক গ্যাসের চেয়ে এই সংনমিত জৈবগ্যাস কোনও অংশে কম কার্যকর নয়। যদি এর ব্যবহারে যুগপৎ সরকারি ও বেসরকারি প্রয়াস বাণিজ্যিক রূপ নেয়, আমরা ইত্যাকার বর্জ্যকে আর ঘৃণা বা উপেক্ষা জানাতে পারব না। ভারত এইসব জৈব উৎসের এক প্রকাণ্ড আধার। এইগুলিকে যথাযথভাবে উৎপাদনমুখী কর্মে ব্যবহার করতে পারলে সেই গ্যাস নাগরিকদের জীবনযাত্রায় নতুন ও সমুন্নত মাত্রা আনবেই। সেই সঙ্গে হ্রাস পাবে পরিবেশ দূষণ। সঙ্গত কারণেই বর্জ্যের অবস্থান ক্ষেত্রগুলির আয়তনকে করতে হবে বৃহৎ ও যথাসম্ভব স্বাস্থ্যসম্মত। কৃষকরা কর্ষিত জমির বর্জ্য বিক্রি করে নিজেদের উপার্জন বাড়াবেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যকার দূরত্ব কমে আসবে। খনিজ তেলের আমদানি হ্রাস পাওয়ায় সরকারের ব্যয়ভারও হ্রাস পাবে। যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যয় পূর্বাপেক্ষা সহনশীল হবে। সৌরশক্তির পাশাপাশি এই শক্তিও আমাদের জীবনযাত্রাকে অধিকতর কেতাদুরস্ত করে তুলতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। ব্যাপারীরা লাভবান হবেন। শিল্পপতিরাও তাঁদের কর্মকাণ্ডের পরিধিকে বিস্তৃততর করতে উৎসাহী হবেন।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক)

ভিখিরি মনোবৃত্তিসম্পন্ন জাতি

যে সমাজের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও এলিট সম্প্রদায়ের চালিকাশক্তি হয় তৃতীয় মেধা সম্পন্ন রাজনৈতিক দল, যে সমাজের গৃহলক্ষ্মীর একাংশ সরকারি অনুদানের ফলে সংসারে অলক্ষ্মীর ছায়া নামিয়ে আনে, যে সমাজের যুবশক্তি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় একটু কর্মসংস্থানের জন্য, যে যুবসমাজকে দিশা দেখাতে চোখের সামনে কোনো আদর্শবান মনীষী বা সংস্থা নেই, যে সমাজের প্রশাসনের রাজনীতিকরণ সমাজ অবলীলায় মেনে নিতে বাধ্য হয়, সমাজ অতীত বীরদের ভুলে যায় এবং শাশ্বত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্য গর্ববোধ করে না, সে সমাজ সর্বদিক দিক হতে দারিদ্র্যগ্রস্ত। শিক্ষাবিদ হুমায়ুন কবির একদা একথাই বলেছিলেন একটু অন্যভাবে। এই জাতি যে সাংস্কৃতিক দিক থেকে আজও পরাধীন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। তারা এই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। দেশ একসময় চিরকালীনই পরাধীনতার নাগপাশে থেকে বিলীন করে তার সার্বভৌমত্ব। এভাবে একসময় পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়েও যায়। যেমন মিশরের মতো অনেক দেশ। ভারতবর্ষের পরিস্থিতিও অনেকটাই সেই পথে, আর তা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে আমাদের বুদ্ধিজীবী ও এলিট সম্প্রদায় ও কতিপয় রাজনৈতিক দল, যারা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জন্য গর্বান্বিত নয়।

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপুকুর পূর্ব মেদিনীপুর।

নির্বাচন, না প্রহসন?

কলকাতার পুরসভা নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে হই হই করে। এ জয় প্রত্যাশিত ছিল। কারণ নির্বাচনের দিন পেশীশক্তি, অস্ত্র, হুমকি, ধমকি, মারপিট, বুথ দখল, বুথজ্যাম, ভীতি প্রদর্শন, বুথ থেকে বিরোধী দলের এজেন্টদের বের করে দেওয়া, ফলস্ ভোটিং, রিগিং তথা ভোট ডাকাতির মাধ্যমে এ জয় ছিল শাসকদলের প্রাপ্য। তাই তারা দখল করেছে ১৪৪ আসনের মধ্যে ১৩৪টি। আর বিজেপি ৩টি, বামফ্রন্ট ২টি, কংগ্রেস ২টি এবং নির্দলরা পেয়েছে ৩টি আসন। এযেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি।

মমতা ব্যানার্জির স্বৈরাচারী শাসনে এটা হওয়ারই ছিল। কারণ যাঁর রাজনৈতিক আদর্শই হচ্ছে বিরোধী পক্ষকে শূন্য করে দেওয়া, তাঁর কাছ থেকে বিরোধীরা বিশেষত ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী জনগণ আর কীই-বা আশা করতে পারেন? তাছাড়া যে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন শাসকদলের দলদাস, সেই রাজ্যে গণতন্ত্র যে কবরের শান্তিলাভ করবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে শাসকদলের মনে রাখা উচিত, হিটলার, মুসোলিনি, স্ট্যালিন, চেসেস্কু, হোনেকার, পলপট স্বৈরতন্ত্রের স্টিমরোলার চালিয়েও কিন্তু তাদের শাসনকাল দীর্ঘায়িত করতে পারেনি। জনরোষে তাদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। জনতাই করেছে তাদের বিচার। তাছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থাকেও দেশবাসী ছুঁড়ে ফেলেছে। প্রত্যাখ্যান করেছে এ রাজ্যের সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ও জ্যোতি বসুর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকেও। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা এ রাজ্যে আজ ব্রাত্য। তাই পুলিশ-প্রশাসনের প্রশ্রয় ও ক্লীবতাকে হাতিয়ার করে শাসকদল আশ্রিত সমাজবিরোধী এবং পার্টি ক্যাডাররা গণতন্ত্রকে জবাই করে, যেভাবে ভোট ডাকাতি করে দলকে ক্ষমতাসীন করেছে— তাও এক সময় ইতিহাস হয়ে থাকবে। কংগ্রেস, কমিউনিস্টদের পাশে লেখা থাকবে তৃণমূল কংগ্রেসেরও নাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার, কলকাতার পুর নির্বাচনে বহু বুথে কোনো কোনো বিরোধীদল পেয়েছে একটি-দুটি ভোট। কোথাও-বা শূন্য। এমনকী, জামানত জব্দ হয়েছে বিরোধীদের রেকর্ড সংখ্যক বুথে। ভোট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিরোধীশূন্য প্রায় সব বুথ ছিল শাসকদল আশ্রিত সমাজবিরোধীদের দখলে। অধিকাংশ বুথ ছিল বিরোধীদলগুলির এজেন্ট শূন্য। সিসি টিভি ক্যামেরাগুলিকে অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। ভোট শুরুর আগেই প্রায় প্রতিটি বুথের বিরোধীদলের এজেন্টদের ভয় দেখিয়ে, মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাউকে -বা রাখা হয়েছে দর্শক করে। গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের একটাই প্রশ্ন, কলকাতার পুরনির্বাচন সত্যিই কি নির্বাচন না প্রহসন?

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব হিসেবে আমরা পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে আজকের আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলেছে। প্রথম দিকে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করত। একে অপরের বিপদে আপদে সবাই ছুটে আসত। একটা যৌথ পরিবারে বাবা, কাকা, কাকিমা, পিসিমা, দাদু, ঠাকুমা একসঙ্গে বসবাস করত। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও একে অপরের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা দেখা যেত। সন্ধেবেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ দেখিয়ে বড়োদের প্রণাম করা হতো। মা কাকিমারা বিকেলবেলা পা ছড়িয়ে বসে গল্পগুজব করত। শিশুরা বড়োদের স্নেহ ভালোবাসায় বড়ো হতো। তখন শিশুর শৈশব বইয়ের পড়ার ভারে নষ্ট হয়ে যেত না। মাঠে-ঘাটে, খেলাধুলা করে শিশুরা বড়ো হতো। গ্রামেগঞ্জে বিশুদ্ধ জল-আলো-বাতাসের মধ্যে এতো কঠিন রোগব্যাধি ছিল না। এখন মানুষ স্বার্থপরতা ও হিংসায় ডুবে গিয়েছে। আজ যৌথ পরিবার খুব একটা দেখা যায় না। ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ ও মানবিকতা। আগে মাঠে, খালে-বিলে প্রচুর মাছ জন্মাতো, এখন বর্ষার পর বিভিন্ন জলাশয়ে কই, শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছ তেমন পাওয়া যায় না। গ্রামে গবাদি পশুপাখি মরলে শকুন ও কাক দলবদ্ধভাবে আসতো, সেগুলো খেতে। খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে এই শকুন আজ আর চোখে পড়ে না। শকুন ছাড়াও অনেক চেনাজানা পশুপাখি আজ আর দেখতে

ফ ঃ ৩

পাওয়া যায় না। আধুনিক সভ্যতায় শিল্পায়ন ও নগরায়ণের জন্য মানুষ বনভূমিকে নির্বিচারে কেটে ফেলেছে। ফলে এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডার, বনবিড়াল, ডোডোপাখি, নীলগাই ইত্যাদি পশুও আর দেখতে পাই না। বাঘ, সিংহ, হাতি এখন হাতে গোনা যাবে। গ্রামে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে পালকির ব্যবহার ছিল। আজ তার ব্যবহার নেই বললেই চলে। গ্রামেগঞ্জে যে রেডিয়ো ও টিভি মানুষকে বিনোদন দিত। সেগুলো আর নেই, তার জায়গায় মোবাইল ও এলইডি এসেছে। মানুষ এখন স্মার্ট ফোনে সবসময় ডুবে রয়েছে। ফলে মানুষের লোভ আর লালসার শিকার হচ্ছে কতো হাজার হাজার নারী। ভোগ বিলাসিতায় মত্ত হয়ে এখন নিজের বাবা-মাকে পর করে একটি নিউক্লিয়ার পরিবার নিয়ে বসবাস করছে। ফলে এখনকার ছেলে-মেয়েরা ছোটো থেকে স্নেহ-ভালোবাসা, দায়িত্ব-কর্তব্য, মূল্যবোধ শিখছে না। শিখছে শুধু হিংসা আর স্বার্থপরতা।

তখনকার দিনে মানুষের এতো রোগ ছিল না। এখন নিত্যনতুন ভেজাল খাবার আর ফার্স্ট ফুড খাওয়ার জন্য মানুষের নানা জটিল রোগব্যাধি হচ্ছে। আগে মানুষ এতো স্বার্থপর ও ভোগবিলাসী ছিল না। মানুষ দিনের পর দিন তার মানবিক গুণগুলি হারিয়ে ফেলছে। তাই অতিরিক্ত ভোগ বিলাসিতার জন্য চুরি ডাকাতি বা খুন করতেও পিছু-পা হচ্ছে না। যেখানে সেখানে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের জন্য পরিবেশের নির্মলতা হারিয়ে গেছে। ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে। আগের মতো ছ'টি ঋতুর প্রভাব এখন আর দেখা যায় না। কেবলমাত্র শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এই তিনটি ঋতু দেখা যায়। তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে হিমবাহগুলি দ্রুত গলতে শুরু করেছে। অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ হারিয়ে আজ মানুষ অতি আধুনিকতায় বিলাসবহুল জীবনে ডুবে আছে। হারিয়ে যাওয়া মানবিক গুণ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সম্পদকে রক্ষা করতে হবে, তবেই মানুষ বাঁচাতে পারবে তার সভ্যতাকে।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

কলেজে সমাজবিরোধীর দৌরাত্ম্য

দুষ্কৃতী তাণ্ডবে ও সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্যে মালদহের চাঁচল কলেজের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর, তুলসীহাটা, স্বরূপগঞ্জ, পিপলা, মোকদুমপুর, হাজাতপুরের ছাত্রীরা গুন্ডাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ক্লাসে ঢুকতে পারে না। লকডাউনের আগে এবং লকডাউনের পরে চাঁচল কলেজ খোলামাত্রই সমাজবিরোধী বাহিনীর গুন্ডারা ছাত্রীদের টানাতে টানতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মিছিলে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সবাই দেখেছে। ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়ে ছাত্রীদের ভর্তি করা, চাঁচল কলেজের টিআরসি-র থেকে টাকা নেওয়া, কলেজের দরজা জানালা ভেঙে দেওয়া, কলেজের সম্পদ লুঠ করা তাঁদের অধিকারের মধ্যে এসেছে।

চাঁচল কলেজে শুধু তোলাবাজি, হুমকি ও বাইক বাহিনীর তাণ্ডব চলছে। কলেজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাদের লক্ষ্য সবসময় বাইকের তেলের টাকা জোগাড় করা। কাজেই সফট টার্গেট হিসেবে চাঁচল কলেজের ভয়ার্ত ছাত্রীদের হাইজ্যাক করাই এবং মিছিলে নিয়ে যাওয়া তাদের কাজ। গুন্ডাবাহিনীর নেতা বাবু সরকার। দশ বছর আগে এই বাবু সরকার মোস্তাকিম আলম নামে চাঁচল কলেজে নাম লিখিয়েছিল। এখন বাবু সরকারের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। তারপরেও কলেজে বাবুর দৌরাত্ম্য সমান ভাবে চলছে। আনন্দ বাজারের ভাষায় এই বাবু সরকার একজন লড়াকু নেতা। একটা ত্রিশ বছরের লোকের চাঁচল কলেজ থেকে ছাত্রীদের মিছিলে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে বড়ো নোংরামি, বড়ো অপরাধ আর কী হতে পারে। লক ডাউনের পর চারবার বাবু সরকার ছাত্রীদের জোর করে মিছিলে নিয়ে গিয়েছে। তার অপরাধের তালিকা দীর্ঘ। মেয়েদের উপর অত্যাচার করা, তাদের অপহরণের ভয় দেখানো, আর মারদাঙ্গা তো আছেই। এসব নানা কারণে বাবু সরকারের বিরুদ্ধে বহু ফৌজদারী মামলা চাঁচল ও মালদহ থানায় ঝুলে আছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন গুন্ডা বদমায়েশরা বাইক চুরি থেকে মোবাইল চুরি, পুলিশকে মারধর করার কাজে লিপ্ত। হরিশ্চন্দ্রপুরের এক তৃণমূলের ছাত্রনেতা মোবাইল চুরির দায়ে ধরা পড়েছে! বার বার বাবু সরকার চাঁচল আদালত থেকে জামিন নিয়ে আসে আর চাঁচল কলেজে ভাঙচুর চালায়।

তৃণমূল ছাত্রপরিষদ মিছিলে ছাত্রীরা না গেলে, তাদের অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, বই-খাতা বাবু সরকার আটকে রাখে। ছাত্রীরা ভয়ে পালাতে চেষ্টা করলে তাদের ব্যাগ ধরে টানাটানি চলে। ছাত্রীদের ফর্মফিলআপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মিছিলে গেলেই তারপর ফর্ম ফিলআপ করার কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থিত বক্তাদের সঙ্গে বাবু সরকার ও তার গুন্ডাবাহিনী খাবারের জন্য টাকাপয়সা দাবি করতে থাকে।

চাঁচল কলেজ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উত্তর মালদহের এসডিও চাঁচল কলেজের প্রশাসক। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে চাঁচল কলেজে গভর্নিং বডি নেই। কলেজে তাণ্ডব চললে এসডিও তথা প্রশাসক দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন। কলেজের টিআইসি থেকে প্রশাসক সকলেই গুন্ডাদের প্রশ্রয় দেন। প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে রতুয়ার এমএলএ রহিম বক্সী চাঁচল কলেজের ভিতরে সারাদিন ঢুকে মিটিং করে, বল লোফালুফি করে আর কলেজের প্রশাসক তথা এসডিও বললেন, তিনি নাকি খোঁজ নেবেন। চতুর ও ধুরন্ধর প্রশাসক চাঁচল কলেজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রহিম বক্সীর ছেলে বাবু বক্সী রতুয়ার হাট দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মানুষ সেখানে প্রতিরোধ করছেন।

—সুপর্ণা দাস, রিয়া নাসরিন, তনুজা খাতুন,
রতুয়া, মালদহ।

শিশুর জীবনে খেলনার গুরুত্ব অপরিসীম

সুতপা বসাক ভড়

মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে আমরা শিশুদের খেলার জগতে আমূল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। টিভি, কম্পিউটার, মোবাইলের যুগে তারা নানান প্রকার কার্টুনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এই কার্টুনগুলো বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে। সেই দেখে শিশুরা হাতে খেলনা-বন্দুক তুলে নিয়ে সবাইকে 'মিছিমিছি' গুলি করে 'খেলছে'। পারম্পরিক পুতুল খেলা বা অন্যান্য খেলাগুলি তারা আর খেলে না। খেলনার দোকানে কামান, বন্দুক, রাইফেল, একে-৪৭, মাউজার পিস্তল ইত্যাদির বিক্রি বেশি হয়। এছাড়া আমরা দেখতে পাই যে, এখনকার ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরাও মারধোর, হিংসা-অপরাধ সংবলিত ধারাবাহিক ও সিনেমা মন দিয়ে দেখে। ফলস্বরূপ, তাদের খেলাধুলার মধ্যেও হিংসার সমাবেশ হয়েছে। শিশুরা হাতে খেলনা পিস্তল নিয়ে সিনেমার মতো করে কথোপকথন করছে— এমন দৃশ্য অনেক পরিবারেই দেখা যায়। এইসব সাংঘাতিক খেলনা নিষ্পাপ শৈশব ছিনিয়ে নিয়ে তাদের একটি হিংসাত্মক প্রবণতার প্রতি অজান্তেই আকৃষ্ট করে চলেছে। খেলা ও খেলনা শিশুদের মধ্যে সৃজনশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যম। একদিকে পুতুলখেলার মাধ্যমে তারা একটি সংগঠিত পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, অপরদিকে এক্কা-দোক্কা, কুমির-ডাঙা, লাফ-দড়ি, চোর-পুলিশ, কবাডি, হা-ডু-ডু ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ হতে থাকে। টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল, ছোটোদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ভালোভাবে করে না। চোখে মোটা চশমা এসে যাচ্ছে, মাথাব্যথা তো অতি সাধারণ; এরপরও পড়াশোনার চাপ তাদের একপ্রকার মানসিক রোগী তৈরি করে ফেলছে।

সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ভালো খেলনা শিশুদের পারম্পরিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে। এজন্য আগে খেলনা বানানোর উদ্দেশ্য ছিল, সেগুলি যেন শিশুদের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সহায়ক হয়। ছোটোরা খেলনার জন্য বায়না করে থাকে। মা-বাবা তখন তাদের বায়না মেটাবার জন্য অনেক সময় মন থেকে না চাইলেও বা ক্রয়ক্ষমতার বাইরে হলেও ওইসব খেলনা কিনে দেন। এদিকে খেলনা উৎপাদকেরা ব্যবসা করে। তাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিক্রি বাড়ানো ও লাভ করা। সেজন্য লাদেন, বীরাপ্পনের পুতুল, যুদ্ধে ব্যবহৃত বিধ্বংসী নানাধরনের খেলনা বাজারে এনে তারা বাজার কুক্ষিগত করতে চায়। ছোটোদের রুচির ওপর বাজারে আসা নতুন খেলনা ও বিজ্ঞাপনের গভীর প্রভাব পড়ে এবং অতি সহজেই তারা সেই বিজ্ঞাপনের মোহজালে জড়িয়ে পড়ে।

এছাড়া, কয়েকদশক আগেই খেলনার জগতে বার্বি-ডলের আর্বির্ভাব হয়েছে। একটু দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, বার্বির শারীরিক গঠন, তার পোশাক, সামাজিক স্থিতি, কোনোটাই আমাদের ঘরের বাচ্চাটির সঙ্গে মানানসই নয়। অথচ, ওই উদ্ভিন্নযৌবনা- সোনালি চুলের মহার্ঘ্য পুতুলটি আমাদের ঘরের কেবল শিশুকন্যাটিরই নয়, শিশুপুত্রের মনও কলুষিত করছে। ওই ধরনের খেলনাগুলি মূলত বিদেশি মানসিকতায় তৈরি। সমাজের সর্বত্র ওই ধরনের পুতুল, তার বিদেশি প্রভাব নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা এর কুফল সমাজে দেখতে পাচ্ছি। মেয়েদের কেবলমাত্র পণ্যরূপে দেখানোর সাঙ্ঘাতিক প্রচেষ্টার কুফল আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। আগে খেলার পুতুলগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল শিশুদের মতো। সেই পুতুল খেলায় ভবিষ্যৎ পরিবার, সমাজ ও দেশ শক্ত বাঁধুনিতে বাঁধা থাকত। থাকত খেলনা হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, কুকুর, বেড়ালেরও ভূমিকা। এছাড়া আগে খেলনায় মহাপুরুষদের মূর্তি অবশ্যই থাকত। খেলার মাধ্যমেই বাচ্চারা তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতো। খেলার ছলে হলেও তাঁদের জন্মদিন পালন করা হতো। আর এখন? আমরা কতজন নতুন প্রজন্মের হাতে তাঁদের মূর্তি তুলে দিই? ছোটোরা দেশের ভবিষ্যৎ। ছোটোবেলার খেলনা ও খেলা তাদের মধ্যে আজীবন প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমরা দেখেছি, অনেক সময় ছোটোরা কার্টুনের কোনও চরিত্রকে নকল করতে গিয়ে অজান্তেই বিপদ ডেকে আনছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ছোটোদের রুচির পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক, তবে এই পরিবর্তন সঠিক পথে হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বাড়ির মহিলারা মাতৃসুলভ ব্যবহারে অতি সহজেই তাদের মনকে ইতিবাচক দিকে চালনা করতে পারেন। কামান, বন্দুক ইত্যাদির স্থানে প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, পারম্পরিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন করবে, এমন দেশীয় খেলনা বানানো যেতে পারে। শিশুদের কোমল হৃদয়ে নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে সচেতন নাগরিকের দায়িত্ববোধ রোপণ করার গুরুদায়িত্ব মূলত মায়েদেরই। ▯

পা ফাটায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

শীতের হাওয়ার রুক্ষ্মতা শুষ্ক ত্বকে নানা সমস্যা ডেকে আনে। পা ফেটে যাওয়ায় কষ্ট অনেকেই পান। এমনিতেই শীতে কম বেশি চামড়া ফাটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পা ফাটা এতটাই মারাত্মক যে ফাটল তৈরি হয়েছে। হাত-পায়ের চামড়া ফেটে গিয়ে রক্ত বেরোনোর ঘটনা কিন্তু স্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ত্বকের অন্য কোনো বড়ো সমস্যা হয়েছে, যা শীতকালে বেড়ে গিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পা ফাটা রোগ বলে গণ্য হবে, তা ব্যাখ্যা করলেন হোমিওপ্যাথি বিশেষজ্ঞ ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক—

হেরিডিটারি পামোপ্লান্টার কেরাটোডার্মা : এটি এক ধরনের জিনবাহিত রোগ। এক্ষেত্রে রোগীর ত্বক প্রচণ্ড পুরু যা, স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয় না। এই ধরনের রোগীর হাত-পা খুব বেশি ফাটে। এমনকী তাদের দৈনিক কাজকর্ম পর্যন্ত ব্যাহত হয়। এর কোনো দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা হয় না। সম্প্রতি রেটিনয়েডস জাতীয় কিছু ওষুধে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের সমস্যা নিয়ে চলতে চলতে রোগী নিজস্ব মেকানিজম তৈরি করে নেন। সেই ভাবেই তাঁরা রোজকার কাজকর্ম চালিয়ে যান।

সোরিয়াসিস : এটি কিন্তু পুরোপুরি জিনবাহিত নয়। এই রোগটিকে বলা হয়, জেনেটিক্যাল মিডিয়েটেড ডিজিজ। হাত-পায়ে চাকা চাকা দাগ হয়ে যাওয়া, চুলকানি, ছাল ওঠা— এগুলি এ রোগের আরও একটি উপসর্গ, হাত-পা ফেটে যাওয়া। বিশেষত পা ফেটে লম্বা লম্বা ফিশার মতো হয়, যেখান দিয়ে রক্তও বেরোতে পারে। শীতকালে এই ফাটা বেশি বাড়ে। জ্বালা-যন্ত্রণাও বাড়বে এই ধরনের সমস্যায়।

চিকিৎসা : রোগ সারতে সময় লাগে। খাওয়ার ওষুধ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ফাটা জায়গায় লাগানোর জন্য অ্যান্টি ব্যাকটিরিয়া ক্রিম, ফুসিডিক অ্যাসিড ক্রিম দেওয়া হয়। পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভালো মানের ময়শ্চারাইজারও এই সোরিয়াসিস নিরময়ের ভালো কাজ দেয়।

এগজিমা বা অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস : সোরিয়াসিসের সঙ্গে এই রোগের ক্ষেত্রে পা ফাটার পার্থক্য অনেক সময়েই বোঝা যায় না। তখন আলাদা করে ত্বকের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। একে বলা হয় হিস্টোপ্যাথলজি।

চিকিৎসা : সোরিয়াসিসের চেয়ে এই রোগ সারতে কম সময় লাগে। ওষুধের প্রয়োগও কম করতে হয়। ত্বকে লাগানোর ক্রিম দুটি ক্ষেত্রেই মূলত এক। তবে খাওয়ার ওষুধের মধ্যে অবশ্যই বিশেষ তফাৎ রয়েছে।

পিটরিয়াসিস রুবরা পাইলারিস (পিআরপি) : এটিও একটি জিনবাহিত রোগ। এই রোগ যাদের আছে শীতকালে তাঁদের হাত-পা প্রচণ্ড শুষ্ক হয়ে যায় এবং সোরিয়াসিসের মতোই পা ফেটে যায়।

চিকিৎসা : খাওয়ার ওষুধ এবং পায়ে লাগানোর ওষুধ দেওয়া হয়।

সাবধানতা : যেসব ব্যক্তিদের এই ধরনের সমস্যাগুলি থাকে, তাদের সবসময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ শীতে এই রোগের প্রকোপ বাড়ে।

মোজা পরে থাকা : শীত অল্প পড়লেই মোজা পরার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। কারণ এতে ঠাণ্ডা, দূষণ, ধুলোবালি সবের হাত থেকেই পা বাঁচিয়ে রাখা যায়।

নুন জলে পা ভেজানো : আধ বালতি ঈষদুষ্ণ জলে এক চিমটে নুন দিয়ে যদি সেই জলে পা আধঘণ্টা চুবিয়ে রাখা যায়, তবে বেশ আরাম পাওয়া যায়। এটি অবশ্য যাদের পা ফাটার সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য নয়। পা ভালো রাখতে যে কেউ করতে পারেন। কারণ শীতকালে যাদের অল্প অল্প পা ফাটে বা পা ফাটতে শুরু হয়ে যায় তাদের পা ভালো রাখতে এটি খুব কার্যকর একটি ঘরোয়া উপায়।

স্ক্রাবিং : পিউমিস স্টোন দিয়ে নিয়মিত পা স্ক্রাব করা সকলের জন্যই জরুরি। এতে পায়ে ময়লা জমে না।

তেল ও ময়শ্চারাইজারের ব্যবহার : স্নানের আগে ভালো করে নারকেল তেল মাখলেও উপকার পাওয়া যায়। স্নানের পরেও ভালো ময়শ্চারাইজার বা বডি বাটার পায়ে লাগানো উচিত।

স্টেরয়েড ক্রিম লাগানো : যদি এর পরেও পা ফাটা না কমে, তখন স্টেরয়েড ক্রিম দেন চিকিৎসকরা। টানা এক বা দেড়মাস ওই ক্রিম লাগালে অনেকটাই উপকার পান রোগী। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনও এই ধরনের ক্রিম ব্যবহার করা উচিত নয়। পা ফাটার এই সমস্যাগুলি অধিকাংশই আগেভাগে সতর্ক হলে এড়ানো সম্ভব। ওষুধ খাওয়ার মতো বাড়াবাড়ি পর্যায়ে তা খুব কম ক্ষেত্রেই পৌঁছায়। তবে পা ফাটা আদৌ চর্ম রোগ না কী শীতে ফাটা, সে সম্পর্কে সচেতনতা জরুরি।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : পা ফাটার ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসু। সোরিয়াসিসের চিকিৎসা ফলপ্রসু। সোরিয়াসিসের চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে সম্ভব। ওষুধগুলি প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছি সেগুলি হলো গ্রাফাইটিস, পেট্রোলিয়াম, আগারিকাস, সালফার, টিউবার কুলিয়াম, রাসটক্স প্রভৃতি। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিৎ নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতা আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করেন যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ▯

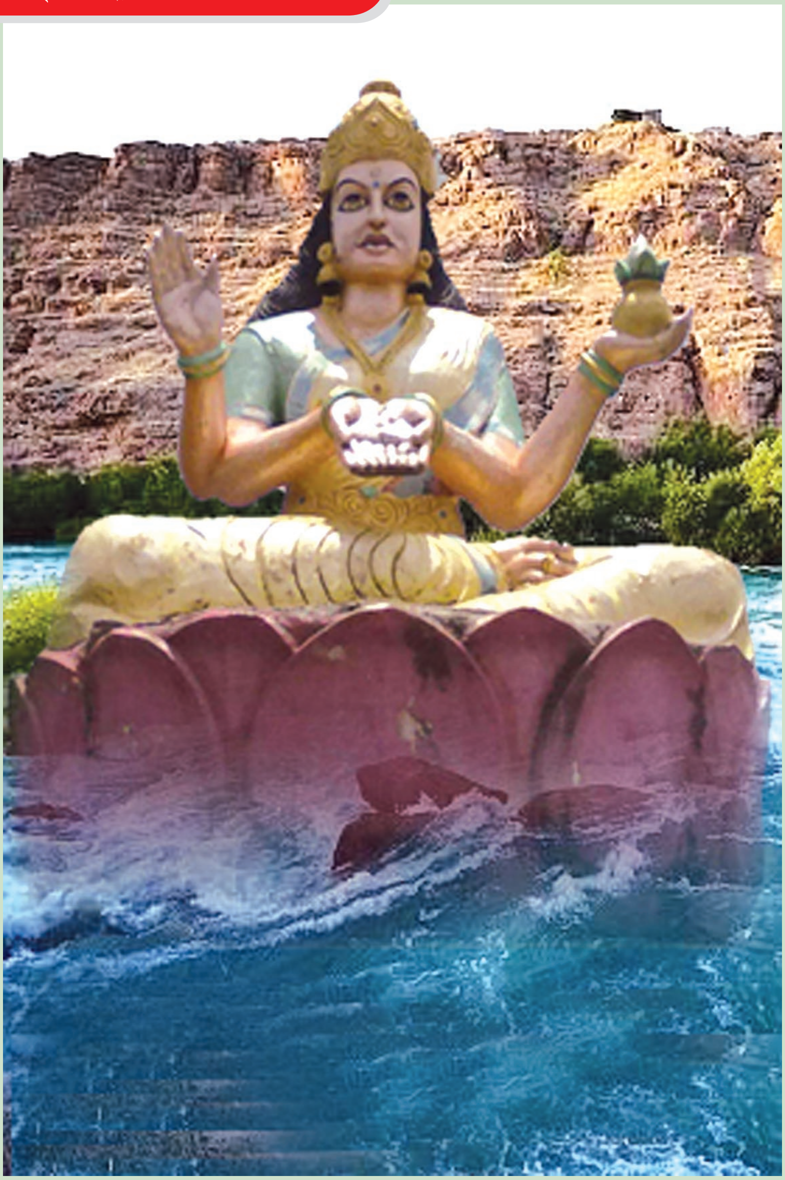

নদী থেকে দেবী

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

নদী থেকে দেবী হয়ে ওঠার উদাহরণ ভারতের ইতিহাসে কম নয়। গঙ্গা, যমুনা, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা ইত্যাদি অনেক নদীই কালক্রমে দেবীত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে। সরস্বতীও তার ব্যতিক্রম নয়। ঋকবেদোক্ত সরস্বতী নদী। সরস্বতীকে বর্ণনা করা হয়েছে এক 'সুবিশাল ও পবিত্র' নদী হিসেবে। কিন্তু ঋকবৈদিক যুগের মধ্যবর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সরস্বতী বর্ণিত হয়েছে ছোটো নদী হিসেবে। এই পর্যায়ে কোথাও কোথাও সরস্বতীকে বলা হয়েছে সমুদ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমুদ্র বলতে এখন আমরা যা বুঝি, ঋকবেদের সময়ে শব্দটির মানে তা ছিল না। সমুদ্র বলতে হ্রদও বোঝানো হতো। অর্থাৎ ঋকবেদের সময়েই সরস্বতী তার বিশালতা হারিয়ে হ্রদে পরিণত হয়েছিল।

এখানে একটি প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে। নদীর হ্রদে পরিণত হওয়ার সঙ্গে তার দেবী হয়ে ওঠার কী সম্পর্ক? ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষ প্রকৃতিপূজক দেশও। এ দেশের মানুষ নদ-নদী, পাহাড়, অরণ্য, বৃক্ষ— যার কাছেই উপকৃত হয়েছে তাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। অন্তরের কৃতজ্ঞতাই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী থেকে শুরু করে বট-অশ্বত্থ-তুলসীকে এদেশের মানুষের কাছে দেব-দেবী করে তুলেছে। নদীমাতৃক সভ্যতায় নদী সকল জ্ঞান, গরিমা ও বৈভবের উৎস। সভ্যতাকে ধারণ ও পুষ্ট করে নদ-নদী।

আমরা যদি প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা থেকে হরপ্পা সভ্যতার পর্যালোচনা করি তা হলে দেখা যাবে এই সিন্ধু নদ ও সরস্বতী নদী এই সভ্যতাকে পুষ্ট করেছিল। ঘগ্গর ও হাকরা নদীর খাত বদলের কারণে সরস্বতী নদী থর মরুভূমিতে অন্তঃসলিলা হয়ে যাওয়ায় এই সভ্যতা নাগরিক বৈভব ত্যাগ করে গ্রামীণ সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং প্রাচীন ভারতে সভ্যতার বিকাশে সরস্বতীর ভূমিকা সহজেই অনুমেয়। জ্ঞানস্বরূপ নদীর গর্ভেই দেবী সরস্বতীর জন্ম বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এবং তিনিই কালক্রমে হয়ে ওঠেন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী আজকের বীণাপাণি সরস্বতী। □

বাণী বন্দনায় বসন্ত বরণ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

নদীর নামে দেবী, নাকি দেবীর নামে নদী। ঘুরে ফিরে এমনটাই মনে আসে সরস্বতীর কথায়। বিদ্যার দেবী তিনি জ্ঞানদায়িনী। জ্ঞান তো অপার— সমুদ্রের মতোই, তাই কি সেই জ্ঞানেশ্বরীর রূপ কল্পনাতে প্রথমেই মানসমন্দিরে ভেসে আসে নদীর ছবি। নদী বয়ে যায় আপন স্রোতধারায় শুধুই সামনে। যাওয়ার পথে নদী কখনও পুষ্ট হয়, কখনও বা রুষ্ট। জলপ্লাবনে ভাসিয়ে দেয় সব। আবার সেই নদীই গড়ে তোলে নতুন ভূমি। তার পলিতে পলিতে ঊষর জমিকে উর্বর করে। জ্ঞান প্রবাহেও তো তেমনটাই ঘটে। তিমিরান্ধ মনকে তা করে আলোকিত। অজ্ঞানতায় রুক্ষ মানসভূমিকে মাতিয়ে তোলে সৃজন-আনন্দে। দুকূল প্লাবী প্রবাহে জ্ঞানই তো অচেতনকে দেয় চেতনের সন্ধান। মননে চিন্তনে সহস্র দ্যুতির বিভায় উদয় ঘটায় হিরণ্ময় সবিতার।

ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার ভিত্তি ভূমিতে রয়েছে প্রকৃতির নানা লীলার প্রকাশ। দেব-দেবীর কল্পনায় প্রকৃতির এক একটি রূপই মূর্ত হয়ে ওঠে প্রথমে চিন্ময়ী— তারপর মৃন্ময়ীরূপে। জ্ঞান, বিদ্যা, মেধা, শৈল্পিক বোধ, নানা কলাশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর ধ্যানমূর্তিটি গড়ে তোলার সময় ও প্রকৃতির এই স্বাভাবিক জলপ্রবাহ, স্রোতস্বতী তটিনীই নেয় মুখ্য ভূমিকা।

বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ বেদের মন্ত্রে, স্তোত্রেও জল-স্বরূপিণী সরস্বতীর কথাই উচ্চারিত হয়েছে সত্যদ্রষ্টা ঋষির কণ্ঠে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তে বলা হয়েছে, 'সরস্বতীং; দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে' তারমানে— দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞে ব্রতীরা আরাধনার জন্য আহ্বান করেন সরস্বতীকে— যিনি পূর্ণ করেন দাতার সব অভিলাষ। পিতৃগণের সঙ্গে একই রথে এসে আনন্দস্বরূপিণী হয়ে তিনি যজ্ঞদ্রব্য উপভোগ করুন, এমনই প্রার্থনা হোতাদের। সানন্দে তিনি আরোগ্য এবং অন্নদান করুন এমনই কামনা সকলের। ওই স্রোতের সারকথা, সরস্বতী হলেন অন্নদায়িনী-ধনদায়িনী। জননীস্বরূপা জলরাশি তিনি ঘৃতধারার মতোই প্রবাহিনী— সকলের কল্মষনাশিনী। তিনিই পবিত্র করেন সকলকে।

এই কথাই আরও স্পষ্ট ভাবে রণিত হয়েছে অন্য একটি বেদ মন্ত্রে। বলা হয়েছে, 'মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুয়া। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি'— সরস্বতী প্রবাহিত হয়ে প্রভূত জল সৃজন করছেন এবং সমস্ত জ্ঞান উদ্দীপন করছেন। আরেকটি বেদমন্ত্রের কথা, 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী'--- তিনি মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ— দেবীগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। তিনি সমৃদ্ধিদায়িনী।

বেদের দেবী সরস্বতীই এখন আমাদের কাছে পূজিতা মূলত সবরকম বিদ্যার দেবী হিসেবে। শুধু বিদ্যা নয়, তিনি বাক্ বা বাক্যেরও দেবী। বহুনামা এই দেবী। তিনি ব্রহ্মার শক্তিস্বরূপিণী ব্রাহ্মণী, বিজ্ঞানেশ্বরী ব্রাহ্মী, ইতিহাসের দেবী ভারাদী, সংগীত, সুললিত বাক্যের দেবী বাণী ও বাচী, অক্ষয়ের দেবী বর্ণেশ্বরী, কবিদের জিহ্বায় অবস্থিতা কবি জিহ্বাপ্রবাসিনী। দেবী সরস্বতীরই অন্য নাম বিদ্যাদাত্রী, বীণাবাদিনী, পুস্তকধারিণী, বীণাপাণি, হংসবাহিনী। কোঙ্কনি ভাষায় তাঁকে বলা হয় ছাদুবুলুখানি ও শারদা, কন্নড় ভাষায় তিনি শারদাম্মা, তেলেগুতে তিনি কলাইমঙ্গল, নামগগ, কলাইবাণী। তাঁকে ডাকা হয় বরাধানায়কি, সাবিত্রী ও গায়ত্রী নামেও।

মহাভারতের শান্তিপর্বে সরস্বতীকে বলা হয়েছে সমস্ত বেদের জননী। ব্রহ্মার বিশ্বসৃষ্টির

সময় তাঁর আবির্ভাব দিব্য সৃজন সংগীত রূপে। আবার তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে তাঁকে বলা হয়েছে সুললিত বাক্য ও সংগীতের জননী। এই ভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে দেবী সরস্বতীকে নানা সংস্কৃত সাহিত্যে। যেমন অষ্টম শতকে রচিত ‘শারদাতিলক’-এ রয়েছে— ‘তুমি বাগ্‌দেবী, তুমি আমাদের স্বরসম বাগ্মিতার শক্তি দাও। দেবীর পরিধানে রয়েছে চাঁদের আভার মতো উজ্জ্বল বস্ত্র, তাতে সারা অঙ্গ থেকে বিছুরিত হচ্ছে এক স্বর্গীয় দ্যুতি। দিব্য করুণাধারা ঝরে পড়ছে লেখনীর উপর। তাঁরই কৃপায় রচিত হচ্ছে পুস্তক।’

সমস্ত দেব-দেবীর মধ্যে রঙের ব্যবহারে একমাত্র ব্যতিক্রম দেবী সরস্বতী। শুভাঙ্গী দেবীর সব কিছুই শুভ্র। তাই তিনি শুভ্রা। শ্বেতবসনা, শ্বেতবর্ণা দেবী অধিষ্ঠিতা শ্বেতপদ্মে। এই শতদল হলো আলোক, জ্ঞান ও সত্যের প্রতীক। তিনি শুধুই প্রজ্ঞাবতী নন, তিনি অনন্ত বাস্তবতার জ্ঞানস্বরূপা। তাঁর সব কিছুই শুভ্র বর্ণের। এই সিতরূপা হলেন পরম সত্ত্বগুণের প্রাণময়ী প্রতিমা। শুদ্ধতা, অবিমিশ্র জ্ঞান, চিরালোকিত অন্তঃকরণ ও দৃষ্টির সারভূতা দেবী হলেন পরমপ্রজ্ঞার ধ্যানময়ীরূপ।

সরস্বতী কখনও চতুর্ভুজা কখনও-বা দ্বিভূজা। তাঁর হাতে রয়েছে পুস্তক ও লেখনি, বীণাযন্ত্র, জপমালা ও কমণ্ডলু। পৌরাণিক মতে তিনি হলেন ব্রহ্মার স্ত্রী। তাঁর ওই চারটি হাত তাঁর স্বামীর চতুর্মুখের প্রতীক। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার— এই চারের স্বপ্রকাশ ওই চার বাহুতে। তিনি বেদমাতা। তাঁর কণ্ঠের স্ফটিক মালা ধ্যানের আত্মদর্শনের ও আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন। তাঁর জলপূর্ণ কমণ্ডলু হলো সবকিছু পরিশুদ্ধ করার প্রতীক। সদানন্দ, মালিন্যমুক্তি এবং দিব্যশক্তির ইঙ্গিত দেয় ওই মঙ্গলঘট। কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর ওই জলপাত্র পূর্ণ রয়েছে সোমরসে— যা খুলে দেয় জ্ঞানের দুয়ার। তাঁর বীণাযন্ত্র হলো সৃষ্টি ও বিজ্ঞানের প্রতীক, তার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত বিশ্বসংহতির প্রাণময়ী সুর। সরস্বতীকে বলা হয় অনুরাগের দেবী— প্রেম, প্রীতি ও সুরলহরীর প্রকাশ, সবরকম আবেগের প্রকাশ ঘটান তিনি সংগীত ও সুভাষের মধ্য দিয়ে।

সরস্বতী হংসবাহিনী। তাঁর পদতলের ওই হাঁসটিও শ্বেতবর্ণের। শাস্ত্রমতে, দুধ মেশানো জল থেকে শুধু দুধটুকু পান করার ক্ষমতা রয়েছে হাঁসের। অর্থাৎ হাঁস হলো ভালো-মন্দ বিচার, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও আন্তরিক শুদ্ধতার প্রতীক। অবশ্য কোনো কোনো জায়গায় হাঁস নয়, চিত্রমেখলা অর্থাৎ ময়ূর দেখা যায় সরস্বতীর পাশে। বলা হয় এই ময়ূর হলো বৈচিত্র্য ও নৃত্যের প্রতীক। সর্প বিনাশের ক্ষমতাযুক্ত ময়ূর হয়ে মনের সর্পিল ও কুটিল চিন্তাধারার হন্তারকের মূর্তি। অন্য শাস্ত্রীয় কল্পনায় ত্রিদেবের (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) মতো তিনি হলেন ত্রিদেবীর একজন। অন্য দুই দেবী পার্বতী ও লক্ষ্মী।

সরস্বতীর রয়েছে নানা অবতার। ত্রিশক্তির প্রকাশক দেবী সরস্বতী কখনও ব্রহ্মাণী রূপে রণরঙ্গিণী। আবার তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা। তাঁর এই মহাবিদ্যা রূপেরই নাম মাতঙ্গী ও তারা মহাবিদ্যা।

মহাকালী রূপে তিনি সংহার করেন সব অবিদ্যা ও অজ্ঞানতাকে। দূর করেন মনের সব অন্ধকার ও অহংকে। পার্বতীরূপে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা বা চরম সত্য। লক্ষ্মী রূপে তিনি বিদ্যালক্ষ্মী— দান করেন সমৃদ্ধি। গায়ত্রী রূপে তিনি বেদমন্ত্র, আবার সাবিত্রী রূপে তিনিই শুদ্ধতার প্রতীক এবং ব্রহ্মার ঘরণী।

কোনো কোনো পুরাণমতে তিনি অষ্টভুজা মহাসরস্বতী। গৌরীর দেহসম্ভূতা এই দেবীই বধ করেন শুম্ভ ও অসুরদের। বৌদ্ধদের কাছে তিনি মঞ্জুশ্রী বা প্রজ্ঞা। জৈন পুরাণের রয়েছে জ্ঞানদা সরস্বতীর কথা। এখানেও তিনি চতুর্ভুজা। পদ্মাসীনা দেবীর বাহন ময়ূর। জৈন তীর্থঙ্করদের বাণী ও উপদেশ চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার মূলে রয়েছেন এই দেবী সরস্বতী। যে কোনো ধর্মের সরস্বতী মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম হলো কংকালি টিলার মথুরা জৈন সরস্বতী। এটি ১৩২ খ্রিস্টাব্দের মূর্তি।

ভারতবর্ষের নানা জায়গায় রয়েছে সরস্বতীর মন্দির। কালের রোষ এড়িয়ে এখনও পর্যন্ত যে প্রাচীনতম সরস্বতী মন্দিরটি টিকে আছে তার অবস্থান পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সারদা পীঠে। বঙ্গদেশে সন্ধান না-পাওয়া গেলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে বেশ কিছু সরস্বতী মন্দির। সেই সব মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাসারে গোদাবরী নদীতীরে শ্রীগণ সরস্বতী মন্দির, তেলেঙ্গানার মেডাকে ওয়ারঙ্গাল সরস্বতী এবং শ্রীসরস্বতী ক্ষেত্রমু মন্দির। কর্ণাটকের সরস্বতী বা সারদা মন্দিরগুলির মধ্যে বিখ্যাত হলো শৃঙ্গেরি সারদাম্মা মন্দির, কেরলে এনার্কুলাম জেলার উত্তর পারাভুরে দক্ষিণা মুকাম্বিকা সরস্বতী মন্দির, তামিলনাড়ুর কুথানুবের সরস্বতী মন্দির। এছাড়া গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশেও রয়েছে বহু সরস্বতীর মন্দির।

দেবী সরস্বতীর পূজা হয় মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। বাঙ্গলায় ঘরের লক্ষ্মী পূজার পরই সবচেয়ে বেশি আরাধনা হয় এই দেবী সরস্বতীর। এই দিনটিকে বহু ঘরেই পালন করা হয় হাতেখড়ির শুভলগ্ন হিসেবে। অর্থাৎ এই দিন থেকেই বিদ্যারম্ভের চল ছিল গত শতকেও। দেবী সরস্বতীর সঙ্গেই এদিন পূজা করা হয় মস্যাধার লেখনি বা দোয়াত কলম ও বইয়ের।

সামাজিক দিক থেকেও দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিন সংস্কৃতির অনুকরণে যে ভ্যালেন্টাইনস ডে-র এখন রমরমা, বহু প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে তারই একটি পরিশীলিত রূপ দেখা যায় সরস্বতী পুজোর দিনটিতে। সাধারণত এই দিনটিতে মেয়েরা হলুদ বা বাসন্তী রঙের শাড়ি এবং ছেলেরা ওই রঙেরই পাঞ্জাবি পরে মনের আনন্দে বিদ্যালয় বা মণ্ডপে ঘুরে বেড়ায়। দিনটি যেন খুলে দেয় যৌবন-বসন্তে প্রবেশের দ্বার।

সরস্বতী পুজোর দিন বা শ্রীপঞ্চমী তিথিটি বসন্তপঞ্চমী নামেও খ্যাত। একদিকে দোল বা হোলিরও সূচনা হয় এই দিনটি থেকেই। এই দিনটিরই ৪০ দিন পরে পালিত হয় রঙের উৎসব দোল। দিনটি ঘোষণা করে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন বার্তা।

বসন্ত পঞ্চমীরই আরেক নাম মদন পঞ্চমী। দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কামদেব বা মদন ভস্মের কাহিনি। এই দিনটি শিখ সম্প্রদায়ও পালন করেন সমান উৎসাহ ও উদ্দীপনায়। শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমী উৎসবটি পালিত হয় সারা ভারত ছাড়া নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বালি যবদ্বীপ প্রভৃতি জায়গাতেও সমান উৎসাহের সঙ্গে। মূলত এই সময়ে পৃথিবীর অঙ্গে অঙ্গে যে রঙের মাতন দেখা যায় তারই প্রথম প্রকাশ ঘটে এই দিনটিতে। সে কারণেই দিনটি কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় সামাজিক উৎসব ও প্রাণের মিলনেরও দিন।

সরস্বতী বন্দনা একটি অসাম্প্রদায়িক উপসনা ধারা

কল্যাণ গৌতম

সরস্বতী বন্দনা এক সুপ্রাচীন রীতি এবং তা বিশ্ব-মান্যতা পেয়েছে ভারতের মাটি ছাপিয়েই। আজ ইন্দোনেশিয়ার মতো মুসলমান-শাসিত দেশও তাদের বিদেশি দূতাবাসের সামনে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে) দেবী সরস্বতীর শ্বেত স্থাপত্য-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে দ্বিধাবোধ করে না। মধ্য যুগের বাঙ্গালি মুসলমান কবিরা তাদের কাব্য-লেখন শুরু করেছেন সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। কাজী নজরুল ইসলামও দেবী সরস্বতীকে বন্দনা করেছেন ভারতীয় ঐতিহ্য মেনে। ধর্ম ও জাতপাতকে দূরে সরিয়ে বহু নৃত্য-গীতিকার দেবী সরস্বতীর বন্দনা করে আসর জমান। অথচ 'বাঙ্গালি পদবাচ্য' বাঙ্গলার সংস্কৃতি- ধ্বংসকারী কিছু জেহাদি বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী দেবীর মূর্তি ভেঙে চলেছে এবং তার উগ্র-উল্লাস সমাজে প্রোথিত করে দিচ্ছে। শিল্পের নামে সরস্বতীর নগ্ন মূর্তি আঁকছেন- গড়ছেন সাম্প্রদায়িক শক্তির উস্কানিতে জারিত হওয়া আঁতেল শিল্পীগণ। কিছু 'সেকুলার' হিন্দুর প্রাণখোলা সমর্থন এই রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মূর্তি-বিদ্বেষের এই সাম্প্রদায়িক রোগ সহজে সারবার নয়। এরই মধ্যে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, কাশ্মীরের একদা প্রাণকেন্দ্র শারদা পীঠ কেন এখনও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ভগ্নদশায় অবস্থান করবে? কেন এখনও সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থল ভারতবাসীর আরাধনার স্থল হবে না, ভারতবাসীর নিজের জায়গা হবে না?

বিদ্যা ও নৃত্যগীতের আরাধ্যা দেবীরূপে পূজিতা হলেও দেবী সরস্বতী কি বরাবরই বিদ্যা, জ্ঞান ও কলাবিদ্যার দেবী ছিলেন? বিশিষ্ট বিদ্যাবিদ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'ঋগ্বেদের কোনো স্থানে এমন উক্তি নাই যাহা দিয়া দেখানো যাইতেছে যে, সরস্বতী নদী দেবী ব্যতীত আর কিছু।' বরং বেদে পাওয়া যায়, 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী'। সরস্বতী অষ্টাদশ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী, তন্ত্র ও মন্ত্রে কীর্তিতা এবং নৃত্য-গীত ইত্যাদি সকল কলাবিদ্যার দেবীরূপে চিহ্নিতা হলেও আদিতে তিনি ছিলেন জলের দেবী।

'সরস' শব্দের অর্থ জল। শুরুতে সরস্বতী ছিলেন জলের দেবী, নদীরূপে পূজিতা। শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর প্রধান ভূমিকা ছিল। বিদ্যার দেবীর ধারণা এল অনেক পরে। উর্বর নদী উপত্যকায় কৃষির ফলন ছিল পর্যাপ্ত। তাই সরস্বতী নদীতীরে আর্য-ঋষিরা রূপদান করেছিলেন বৈদিক সংস্কৃতির। ঋষিরা প্রত্যহ সে নদীর তীরে বন্দনা করতেন। সেখনেই রচিত হয়েছে বহু বৈদিক সূক্ত। সেহেতু জলের দেবী কৃষি ও উর্বরতাকে ছাপিয়ে হয়ে গেলেন জ্ঞান ও বিদ্যার পরোক্ষ দেবী। সভ্যতার অভ্যুত্থান এবং তার

ক্রমবিকাশে নদী সবসময় সহায়ক ও সঙ্গত ভূমিকা পালন করে এসেছে। তাই কল্পনা করা যেতে পারে সরস্বতী নদীর দু'কূলে সৃজিত পলল মৃত্তিকার উর্বর শস্যক্ষেত্র ছিল আর্য ঋষিদের 'শস্যাগার'। ক্রমে নদী অবলুপ্ত হলেও মানসচক্ষে নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন হলো না। সরস্বতী বন্দনা অব্যাহত রইল। জলের দেবী হোক বা কৃষি, অথবা জ্ঞানের দেবী; সরস্বতী উপাসনা এক সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং তা মান্যতা পেয়েছে ভারতের মাটি ছাপিয়েও বহু দেশে। নীল সরস্বতী বা 'বেনতেন' প্রমুখ দেবীর মধ্যে চীন-জাপান, দূরপ্রাচ্যে, বহির্ভারতে সরস্বতী উপাসনা ও বিশ্বজনীনতা ছড়িয়ে রয়েছে। এ এক অমোচ্য ঐতিহ্য বলেই আজও ইন্দোনেশিয়ার মতো ইসলামি দেশে দেবী সরস্বতী বিস্মৃতির গভীরে পৌঁছতে পারেনি।

'সরস' শব্দের আর এক অর্থ 'জ্যোতি'। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে পাওয়া যায় অগ্নিরূপ, জ্যোতির্ময়ী এক দেবী রূপে। সরস্বতীর মধ্যে সূর্যকিরণের সপ্তমবর্ণের ধারণা VIBGYOR এখানে পরিষ্কার। যেহেতু উদ্ভিদ দেহে বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণের অপরিহার্য শর্ত আলোক ও জল। সরস্বতী তাই সালোকসংশ্লেষ বা Photosynthesis প্রক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সৌরশক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবে জলের আবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, জলের সরবরাহকারিণী দেবী সরস্বতীর সঙ্গে তাই কৃষি উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

'শ্রী' অর্থে লক্ষ্মী। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এক সময় হয়তো লক্ষ্মীপুজোই হতো, এখনও অনেক পরিবারে দেবী সরস্বতীর সঙ্গে দেবী লক্ষ্মীকেও ভক্তি সহকারে ফুল নৈবেদ্য দেওয়া হয়। আর এই দিনটি থেকেই যেন শুরু হয় মুকুল-বিকাশের পর্ব, বসন্তের সৌকর্য, সুপ্তির অবসান, মনের মুক্তির মরশুম। দেবী সরস্বতী উপাসনায় লাগে পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব। ধান, যব, গম, মুগ, তিল দিয়ে এই পঞ্চশস্যের অর্ঘ্য রচিত হয় আর আম, অশোক, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুরের বিটপ দিয়ে সাজানো হয় পঞ্চপল্লব।

পলাশপ্রিয়া হলেন দেবী সরস্বতী। পলাশের রক্ত রং উর্বরতার প্রতীক, আর ঋতুমতী নারীর রজোদর্শনই প্রাণীজন্মের প্রথম শর্ত। দেবী সরস্বতী তাই উর্বরতার অধিষ্ঠাত্রী রূপে পূজিতা; জলের দেবী, আলোর দেবী, উর্বরতার দেবী।

চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখপদ্মরূপ, বনহংসবাহনা সর্বশুক্লা হে দেবী সরস্বতী, তুমি অনন্তকাল আমার মানসলোকে আনন্দের সঙ্গে বিরাজ করো। 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থ-রচয়িতা তথা সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র-প্রণেতা আচার্য দণ্ডী তাঁর মঙ্গলাচরণ শ্লোকে এই ভাবেই সরস্বতী বন্দনা করেছেন।

'চতুর্মুখ-মুখাম্ভোজ-বনহংসবধূরমম্।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্বশুক্লা সরস্বতী।'

ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় সরস্বতী বন্দনা—

'উর দেবী সরস্বতীঃ স্তবে কর অনুমতিঃ
বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনী।
শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাসঃ শ্বেত বীণঅ শ্বেত হাসঃ
শ্বেতসরসিজিনিবাসিনী।'

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতার পূর্বে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ-মনন করেছিলেন। একটি কবিতায় (গাই গীত শুনাতে তোমায়) তিনি লিখেছিলেন,

'বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।'

আমেরিকার নর-নারী তো ভেসেই গিয়েছিলেন, যখন স্বামী বিবেকানন্দ সম্ভাষণ করলেন, 'Sisters and brothers of America.'

রবীন্দ্রনাথও তার 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থে 'পুরস্কার' কবিতায় দেবী সরস্বতীকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করছেন—

'মাগো, একবার ঝঙ্কারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্ব-প্লাবিনা
অমৃত উৎস ধারা।
যে রাগিণী শুনি নিশি দিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত্ত্যমাঝে বহমান
নিয়ত আত্মহারা!
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতরী হতে।
যে রাগিণী চির জন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া
অশ্রু হারিতে জীবন ভরিয়া
ছুটে সহস্র স্রোতে!'

অন্নদামঙ্গল কাব্যে আরও বলা হয়েছে—

'তোমার করুণা যারে/সবে ধন্য বলে তারে/গুণিগণে তাহার গণন।'

শিল্পী ও বিদ্যাবিদরা চান তাদের জীবনের দুঃখনিবৃত্তি। শিল্পজীবনে ও বিদ্যার জগতে আপাত প্রতিষ্ঠাই এই দুঃখ নিবারণ করতে সক্ষম, লাভ হতে পারে জীবনে চলার পাথেয়। তাই কাব্য-সাহিত্যের জগতে, লোকসংগীত ও লোকনাট্যের আসর-বন্দনায় সরস্বতীর স্তব-স্তুতি করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই রীতি মানা হচ্ছে, আধুনিক লোককবিরাও তা অনুসরণ করে থাকেন। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে সরস্বতীর উপর এত বিক্ষোভ? মঙ্গলকাব্যে সরস্বতীবন্দনা তো আছেই, মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সরস্বতীবন্দনায় ব্রতী হয়েছিল! কেউ আপত্তি করতে আসেনি, বন্দনার জন্য কেউ মারধোর খেয়েছেন এমন কথা শোনা যায়নি। পুরো বিষয়টিই যে অসাম্প্রদায়িক ছিল, এই সহজ সত্যটা যেন আজকের বিদ্যাবিদরা মনে রাখেন, দেবীকে না মানলেও লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকটাকে যেন মান্যতা দেন।

কাব্য-সাহিত্যের মুখবন্ধে, শিক্ষা আলোচনা ও শিক্ষাদানের শুরুতে, লোকসস্কৃতির আসরবন্দনায় সরস্বতী বন্দনা একেবারেই অসাম্প্রদায়িক রূপে বিবেচিত হতো। তার দু-একটি প্রমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. কাজী নজরুল ইসলাম একটি লেটো গানের আসরবন্দনায় সরস্বতীকে 'সর্বমঙ্গলা' নামে অভিহিত করেছিলেন।

'এসো গো মা সরস্বতী সর্বমঙ্গলা।
তোমার আসরে বাজে হারমনি বেহালা।'

২. মহম্মদ কবীরের লেখা 'মধুমালতী' কাব্যের সূচনায় সরস্বতী

ফ ঃ ৪

বন্দনা রয়েছে।

'সরস্বতীর পদে করম নমস্কার।
পৃথিবী হইল নৌকা সংসার অপার।।
শির রাখি প্রণমি এ পদে করতার।
গোপত থাকিয়া কর মহিমা তোমার।'

অর্থাৎ মুসলমান কবিরাও সংস্কৃতির এই রীতিকে মেনেই কাব্য রচনা করেছেন। বিদ্যা নিকেতনে সরস্বতীপূজাও সেই আবহমানকাল ধরে প্রচলিত সংস্কৃতির এক পরম্পরা, এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার যোগ আনাটাই এক সাম্প্রদায়িক কাজ হবে। সরস্বতী নদীর তীরে পাললিক মৃত্তিকায় উর্বর কৃষি ও উন্নত জ্ঞানচর্চার স্বীকৃতি ও সংস্কৃতিতে একটি নদী হয়ে গেল দেবী। এটি একটি ধন্যবাদাত্মক চিন্তন।

সুতরাং সরস্বতী বন্দনা ধর্মীয় যত না, তার চাইতেও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। ওঝাদের মন্ত্রে বাদ যান না দেবী সরস্বতী; কখনো দেখা যায় এই ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র মুসলমানি লোক-চিকিৎসকও ব্যবহার করেন। অক্ষয় কুমার কয়াল সংগৃহীত একটি ঝাড়ফুঁক মন্ত্র এই রকম—

'আকর্ণ পূরি এ জুড়ি বাল্মীকির বাণ।
দেবতা অসুর কাঁপে নাহি সহে টান।।
ইন্দ্রের ঘরনি কাঁপে পাতালে বসুমতী।
চৌষট্টি ভৈরবী কাঁপে লক্ষ্মী-সরস্বতী।।'

একটি মুসলমানি ছড়ায় সরস্বতীর কথা আছে; লোকবৃত্তের বাসিন্দারা তার মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি রাখতেন না, আজ কেন সরস্বতী নিয়ে এত ভেদবুদ্ধি রচনা করে বুদ্ধিজীবীরা সরস্বতীকে ব্রাত্য করে তুলছেন? ঢাকা থেকে প্রাপ্ত একটি পুরনো মুসলমানি ছড়া এইরকম,

'ধলা মাইয়া সারিন্দা হাতে
সোনার বরণ কলসি কাঁখে
পাশে বইস্যা প্যাঁচা।'

সরস্বতীকে শিক্ষার অঙ্গন থেকে সরিয়ে সুবিধা করে দিচ্ছেন কাদের? কোনও প্রয়োজন তো নেই! সরস্বতী আরাধনা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সংস্কৃতি ছিল না কোনোদিনই। তার অসাম্প্রদায়িক রূপ বিদ্যালয়গুলিতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। দেবী আমাদের চৈতন্যের বিদ্যা দিন। শারদা পীঠ হলো একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দির এবং বর্তমানে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত এক প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এটি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে বিশিষ্ট মন্দির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম। এর গ্রন্থাগারটির বিশেষ পরিচিতি ছিল, এখানেই রক্ষিত দুর্লভ পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে পণ্ডিতেরা দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে আসতেন। এই প্রতিষ্ঠান উত্তর ভারতে শারদা স্ক্রিপ্টের বিকাশ সাধনে ও জনপ্রিয়করণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে স্ক্রিপ্টটির নামকরণই হয়েছে শারদা স্ক্রিপ্ট এবং কাশ্মীরের নামকরণ হয় 'শারদা দেশ'। এটি এমন একটি মহা শক্তিপীঠ, হিন্দু বিশ্বাস, দেবী সতীর ডানহাত সেখানেই পতিত হয়েছে। এই পীঠ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাছে তিনটি পবিত্র তীর্থস্থানের অন্যতম; বাকি দু'টি হলো মার্তণ্ড সূর্য মন্দির এবং অমরনাথ মন্দির।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজাফফরাবাদ থেকে এই ক্ষেত্রটি প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে এবং শ্রীনগর থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে। নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে এই স্থান ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এটি ১৯৮১ মিটার উঁচুতে। হারমুখ পর্বতের উপত্যকায় নীলম নদীর ধারে শারদা গ্রাম, যাকে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা শিবের আবাস বলে বিশ্বাস করেন। এই শারদা পীঠ হচ্ছে 'শারদার আসন' বা শারদাস্থান', হিন্দু দেবী সরস্বতীর নামে কাশ্মীর দেশ। 'শারদা' একটি একটি প্রোটো-নোস্ট্র্যাটিক শব্দ, যেখানে 'সারভ' কথাটির অর্থ 'জলপ্রবাহ বা নদী' আর 'ডাও' কথাটির অর্থ শিলা। এই শারদা পীঠ তিনটি স্রোতের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল।

পীঠের সূচনা কবে থেকে সে বিষয়ে এখন বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন আছে, তবে এর প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, শারদাপীঠ কেবল একটি মন্দিরই নয়, সেই সঙ্গে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। হয়তো ললিতাদিত্য মুক্তপিড়ার দ্বারা ৭২৪-৭৬০ খ্রিস্টাব্দে চালু হয়েছিল, হয়তো নয়। তবে আল-বিরুনি জায়গাটিকে রেকর্ড করেছিলেন, বলেছেন শারদার একটি কাঠের মূর্তি ছিল। যদিও তিনি নিজে কখনও কাশ্মীরে যাননি এবং তার পর্যবেক্ষণগুলি কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি। 'শারদা লিপি' বলে যা কথিত, তার উদ্ভব কাশ্মীর কিনা সে বিষয়ে ভিন্নতর মতবাদ আছে। তবে শারদাপীঠে যে সেই লিপির ব্যাপক ব্যবহার ছিল এবং সেই প্রতিষ্ঠান থেকেই যে এর নাম অর্জিত হয়েছিল সে বিষয় অনুমান করা সহজ। জনপ্রিয় বিশ্বাস এই, লিপিটি একদা কাশ্মীরেই তৈরি হয়েছিল।

কিছু ইতিহাসবিদের বক্তব্য, শারদাপীঠ কখনই শিক্ষাকেন্দ্র নয়। তাদের ব্যাখ্যা, এই শিক্ষামূলক স্থান থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শারদাপীঠ অঞ্চল ভূমিকম্প-প্রবণ। হয়তো ধসে পড়া পরিত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ স্থানীয় শহুরে মানুষ পরবর্তীকালে ব্যবহার করে নিয়েছে। আর সেজন্যই তার অবশেষ পাওয়া যায়নি। এই অষ্টম শতাব্দী প্রাচীন এই মন্দির ছিল তীর্থস্থান। এখানে উপনীত হতেন দূরবর্তী প্রান্তের তীর্থযাত্রীরা, এমনকী বাঙ্গলার মানুষও। এ এক স্বাভাবিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। একাদশ শতকেও এটি ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় উপাসনালয়গুলির অন্যতম, আলবিরুনির লিপিবদ্ধ ইতিহাসে বর্ণিত। হিন্দুদের দুর্ভাগ্য, এমন প্রাচীন সরস্বতীস্থল পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অভ্যন্তরে। প্রতি সরস্বতী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ভারতীয় হিন্দুরা স্বপ্ন দেখেন, এই পীঠ আবারও হিন্দুদের কাছেই ফিরে আসবে বোধে ও বাস্তবে। পশ্চিমবঙ্গে যে ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে সরস্বতী পুজো ফিরে পেতে চায়, পুজো চেয়ে রক্তাক্ত হয়, তাদের জন্মান্তরের লৌকিক স্মৃতি হয়তো এটাই— পুবে-পশ্চিমের এক অভিন্ন সরস্বতী বন্দনার ধারা। এক অখণ্ড ভারতভূমি। ভারতে ভাতু ভারতী।

'যা কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা যা শুভ্রাবস্ত্রাবৃতা
যা বীণাবরদমণ্ডিত করা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মচ্যুত শঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাম্ পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা।।
শুক্লাং ব্রহ্মবিচার-সার-পরমামাদ্যাং জগদ্ব্যাপিনীং
বীণাপুস্তক-ধারিণীম্ অভয়দাং জাড্যান্ধকারাপহাম্।
হস্তে স্ফটিকমালিকাং বিদধতীং পদ্মাসনে সংস্থিতাং
বন্দে তাং পরমেশ্বরীং ভগবতীং বুদ্ধিপ্রদাং সারদাম্।।' □

ঝাড়গ্রামে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ১৯ ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম জেলার রাউৎরাপুর গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূপতিভূষণ স্মৃতি সেবাশ্রমের উদ্যোগে এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ দীপক কুমারের পরিচালনায় ৮৫ জন গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। নন্দীগ্রাম আর্য সমাজের মহারাজ স্বামী সূর্যানন্দ সরস্বতী শিবিরে উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা বাদল দাস।

মেদিনীপুরে চলচ্চিত্র উৎসব

গত ২৮-২৯ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে প্রদ্যোত স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় মেদিনীপুর চলচ্চিত্র উৎব-২০২১। উৎসবে মেদিনীপুর শহর ও জেলার নির্মাতাদের উদ্যোগে স্বল্প দৈর্ঘ্যের (শর্ট ফিল্ম) ও অনুদৈর্ঘ্যের (মাইক্রো ফিল্ম) ৪৫ টি ছবি প্রদর্শিত হয়। স্থানীয় পরিচালক সুমন্ত সাহা, রজত তালুকদার, রাকিবুল হাসান, অর্কপ্রভ দত্ত এবং আরও কয়েকজনের নির্দেশনায় নির্মিত স্বল্প ও অনুদৈর্ঘ্যের ফিল্ম— মায়া বনলতা, সহজ পাঠের আসর, অন্য প্রেমের গল্প, মুকুট, লাভ ডায়েরি, ডিয়ার ওল্ড হ্যাবিট, এসো সুসংবাদ এসো, এনিমি কলিং ইত্যাদি ছবি ৩ থেকে ১৫ মিনিট সময়ে প্রদর্শিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে নৃত্যম শিল্পীগোষ্ঠী নৃত্য পরিবেশন করে। চলচ্চিত্র উৎসবে রাকিবুল হাসানের ‘অন্তরালে’ ছবিতে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন অদ্রিজা দাস।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক

গত ২৬ ডিসেম্বর কলকাতার ৮৪ নং আশুতোষ মুখার্জি রোডস্থিত সঙ্ঘ কার্যালয়ে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর এবং বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক জি লক্ষ্মণ। সংগঠনের সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী পেশ করেন রাজ্য সম্পাদক বাপী প্রামাণিক। বৈঠকে আগামী রাজ্য সম্মেলনের দিক নির্দেশিকা স্থির করা হয়। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে সংগঠনের কার্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৭৫ দিন প্রবাস এবং সংগঠনের কাজের রূপরেখা বিষয়ে পথপ্রদর্শন করেন মহেন্দ্রজী। বৈঠকে রাজ্য সম্মেলনের পোস্টার প্রকাশ করা হয়।

নারকেলডাঙ্গায় গীতাজয়ন্তী ও বিশ্বশান্তি যজ্ঞ

গত ১ ও ২ জানুয়ারি বাংলা ১৬ ও ১৭ই পৌষ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা জয়ন্তী উদ্যাপন সমিতির উদ্যোগে কলকাতার রাজডাঙ্গা নারকেল ডাঙ্গা নারকেল বাগান মাঠে গীতা জয়ন্তী ও বিশ্বশান্তি

যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রথমদিন নগর সংকীর্তন, বিগ্রহ স্থাপন, পূজা ও ভোগ নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যায় গীতার সারাংশ ও বেদান্ত বিষয়ক আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দিনে সকাল থেকে সম্পূর্ণ গীতাপাঠের সঙ্গে বিশ্বশান্তি যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় ভজন সংগীত ও সমাপন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী পরাশরানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে কসবা, কালিকাপুর, যাদবগড় অঞ্চলের মঠ, মিশন ও মন্দিরের সাধু-সন্ত ও পুরোহিতরা একত্রিত হন।

বাঁকুড়ার মুড়লু গ্রামে জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া ব্লকের মুড়লু গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে বীণাপাণি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এক বিশাল যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার, শালতাড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউরি, ব্রহ্মচারী পরিব্রাজক যোগাচার্য রাজা পাণ্ডে এবং বীণাপাণি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার অরুণ কুম্ভকার। সেদিন সকালে স্বামীজী ও ভারতমাতার সুসজ্জিত ট্যাবলো শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম পরিক্রমা সমাপন্তে বৈদিক শান্তিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির ও দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সকাল ১১টায় ডাঃ সরকার স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও নারকেল ভেঙে রক্তদান শিবিরের উদ্‌ঘাটন করেন। ১৩ জন মহিলা-সহ মোট ৫৭ জন রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাঃ সরকার ভারতমাতা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে যুব সম্মেলনের সূচনা করেন। তাঁকে এবং অন্যান্য অতিথিদের চন্দনের ফোঁটা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অরুণ কুম্ভকার। স্বামীজার জীবন ও দর্শন নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সরকার। শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় একজন শিক্ষক। যুবসমাজের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ব্রহ্মচারী রাজা পাণ্ডে। অনুষ্ঠানের শেষে ২০০ জন দুঃস্থের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ার পর সবাই সহভোজে অংগ্রহণ করেন।

কলিগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মদিনে মালদা জেলার কলিগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে কলিগ্রাম, বগচরা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুয়ের আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতায় কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের পাশে বিবেকানন্দ রোডে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও শঙ্খধ্বনি সহযোগে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন সমিতির সভাপতি অশোক রায় চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোহিতলাল গোস্বামী, বিশিষ্ট নাগরিক নিখিল দেবনাথ, কলিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবজিৎ রায়চৌধুরী এবং কলিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি সুভাষ গোস্বামী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান রেজাউল খান, চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক অনিরুদ্ধ সাহা, কলিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস, চাঁচল ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষা দোলন রায়চৌধুরী, কলিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি রুপা রায় ও রতন দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা, রক্তদান শিবির ও দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরেণের আয়োজন করা হয়।

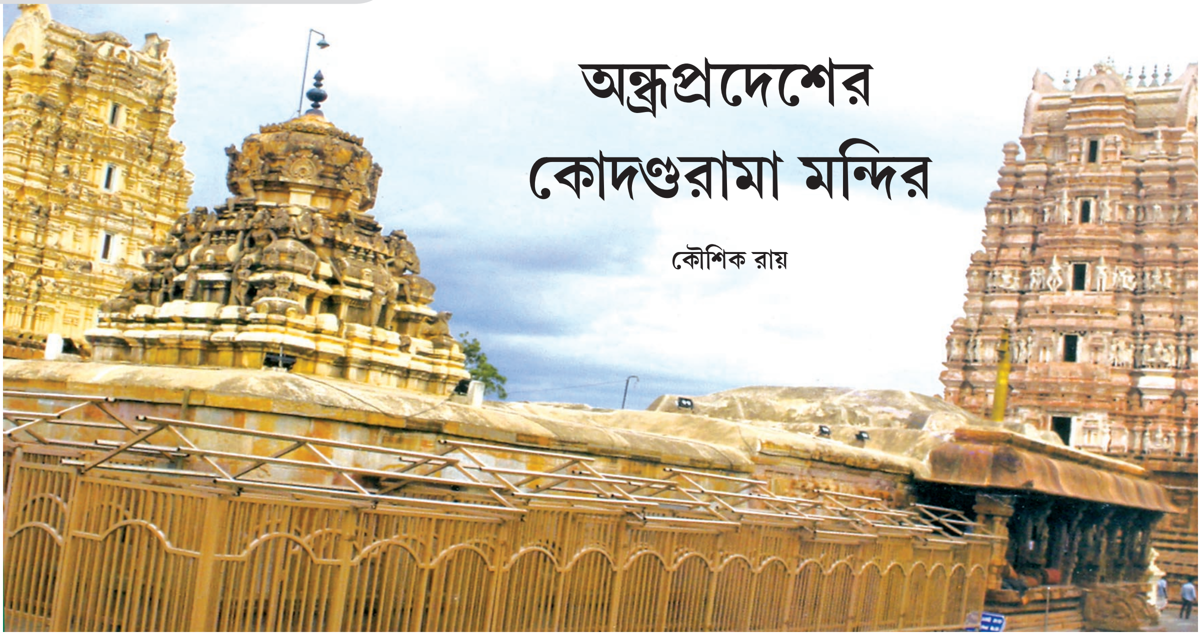

অন্ধ্রপ্রদেশের কোদণ্ডরামা মন্দির

কৌশিক রায়

দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রপ্রদেশে একসময়ে বিজয়নগর নৃপতি কৃষ্ণদেব রায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর আমলে অন্ধ্রপ্রদেশে অন্যতম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছিল তিরুপতি তিরুমালা দেবস্থানমের। তবে, বিজয়নগরের সমৃদ্ধ রাজধানী হাম্পির বিভিন্ন মন্দিরের মতোই অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও দেবালয় নির্মাণ করানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাজা কৃষ্ণদেব রায়। এইসব মন্দিরের স্থাপত্য প্রকরণের মধ্যে গোপুরম বা প্রবেশদ্বার, স্তম্ভ, উপাসনা মণ্ডপ এবং গর্ভগৃহগুলি স্থাপত্য রুচির উজ্জ্বল পরিচায়ক। তিরুপতি নগরী থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অন্ধ্রপ্রদেশের কাড়াপ্পা জেলার অন্তর্গত ভোন্তিমিত্তা গ্রামে বিজয়নগর রাজ্যের রাজারা বানিয়েছিলেন কোদণ্ডরামস্বামী মন্দির। অযোধ্যাপতি, জানকীনাথ, দাশরথি রামচন্দ্রই নবরূপে এই দেবালয়ে পূজিত এবং বন্দিত হচ্ছেন।

ষোড়শ শতকে হাম্পি থেকে প্রাপ্ত বিজয়নগর শিলালিপিতে লেখা আছে— এই কোমাণ্ডরামস্বামীকে 'রঘুনায়ক' নামেও উল্লেখ করা যেতে পারে। মন্দিরটির প্রধান প্রবেশপথের পূর্বদিকের অংশ দিয়ে ওপরে ওঠার সোপানশ্রেণী বা সিঁড়ি বানিয়েছিলেন বিজয়নগরের রাজারা। মন্দিরের প্রবেশদ্বার বা গোপুরমটি পাঁচটি স্তর বিশিষ্ট। এই গোপুরমের প্রস্তর নির্মিত বেদীটিতে আছে বিভিন্ন দেব-দেবী, কিন্নর-কিন্নরীর ছোটো (ক্যামিও) পাথর খোদাই কারুকার্যময় মূর্তি। কোদণ্ডরাম মন্দিরের এই গোপুরমটি সত্যিই স্থাপত্য নিদর্শনের দিক দিয়ে অতুলনীয়। মন্দিরটির প্রাচীরগাত্রে পাথর খোদাই বা রিলিফের মাধ্যমে রামায়ণের বিভিন্ন দৃশ্য এবং আট হাতযুক্ত বিষ্ণুর মূর্তি শোভা পাচ্ছে। এখানে স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে কচ্ছপ বা কূর্ম অবতার ধারণ করে চক্রপাণি নারায়ণের মেরু পর্বত ধারণ এবং মন্থন রজ্জু হিসেবে নাগরাজ বাসুকীকে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও, বিজয়নগরের রাজাদের উপাস্য কুলদেবী ভিত্তালার মূর্তিও আছে এই কোদণ্ডরাম মন্দিরে। মন্দিরটির গোপুরমের দুই দিকে গঙ্গা ও যমুনা দেবীর মূর্তিও আছে। এই মন্দিরের প্রতিটি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে একটি পাথর থেকে। একটি স্তম্ভে দেখানো হয়েছে শ্রীদেবী ও ভূদেবী পরিবেষ্টিত শঙ্খ ও চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে। আবার, আরেকটি স্তম্ভে পাথরের মধ্য দিয়ে সজীব হয়ে উঠেছে ধনুর্ধারী, শ্রীরামচন্দ্রের 'শালপ্রাংশু মহাভূজঃ' মূর্তি। মাখনের টুকরো হাতে শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালের মূর্তিটিও নন্দনীয়। মূর্তিটির দু'দিকে বিনোদবিহারী মধুসূদনের দুই স্ত্রী রুক্মিণী ও সত্যভামার মূর্তি বিদ্যমান। মন্দিরটির প্রধান গর্ভগৃহটিতে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বিগ্রহ আছে। বলা হয় এই তিনটি মূর্তিই নাকি মাত্র একটি পাথর থেকেই (তেলুগু ভাষাতে ভান্তিমিত্তা) বানানো— ঠিক একখণ্ড কাঠ থেকে (দারুব্রহ্ম) তৈরি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তির মতোই। রামচন্দ্রকে এই মন্দিরে বনবাসী আশ্রমিক (বনবাসা কোল্লাম) হিসেবে দেখানো হয়েছে। উৎসবে উল্লসিত অবস্থাতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তিও দেখানো হয়েছে এই দেবালয়ে।

কোদণ্ডরাম মন্দিরে প্রধানতম বা পূর্বদিকের গোপুরমটি ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরও দুটি ছোটো প্রবেশদ্বার আছে। মন্দিরটিতে কল্যাণোৎসব নামক একটি মণ্ডপ আছে। মণ্ডপটিতে রামলিঙ্গ স্বামীর মূর্তি এবং একটি ছোটো শিব লিঙ্গকে পূজা করা হয়। মন্দিরটির মুখোমুখি স্থাপিত হয়েছে রামভক্ত মারুতি হনুমানের বিগ্রহশোভিত মন্দির। এছাড়াও কোদণ্ডরাম মন্দিরে আছে রামতীর্থম ও লক্ষ্মণ তীর্থম নামক দুটি দিঘি।

কোদণ্ডরাম মন্দিরের পূত অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক যশস্বী কবি এবং সংগীতকারের স্মৃতি ঠিক যেভাবে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ। কোদণ্ডরামা মন্দিরে পঞ্চদশ শতকে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন দাক্ষিণাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ তেল্লাপাকা আন্নামাচারিয়া। তাঁকে দাক্ষিণাত্যের তানসেন নামেও অভিহিত করা হতো। কোদণ্ডরামা মন্দিরে পদধূলি পড়েছিল বিখ্যাত তেলুগু কবিশেখর এবং 'অন্ধ্র মহাভাগবতামু' ধর্মগ্রন্থর রচয়িতা বামের পোত্তানার। এখানেই এই মহাকবি দীর্ঘদিন রামচন্দ্র ও বৈদেহীর উপাসনাতে নিয়োজিত ছিলেন।

এগারো দিনব্যাপী রামনবমী উৎসব এই মন্দিরের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। এছাড়া, প্রতি শনিবার কোদণ্ডরামা মন্দিরে অধিষ্ঠানকারী দেব-দেবীর শুদ্ধি বা অভিষেকম অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বৈকুণ্ঠ একাদশী এবং বিষ্ণুবাহন গরুড়ের উৎসবও কোদণ্ডরামা মন্দিরে বেশ ঘটা করেই উদ্যাপিত হয়। এই মন্দিরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সময় রচিত দুইটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে একটি শিলালেখ সম্রাট বীরপ্রতাপ সদাশিব মহারাজের দ্বারা রচিত ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে। শিলালিপিটিতে বলা হয়েছে উদয়গিরি রাজ্যের ভোন্তিমিত্তা গ্রামটি রঘুনায়ক বা কোদণ্ডরামা মন্দিরের নির্মাণের জন্য দান করা হলো। দ্বিতীয় শিলালেখতে মহারাজ বীরপ্রতাপের প্রধানমন্ত্রী এবং আরাভিদু পরিবারের প্রধান স্তত্তি থিরুমালব্যদেব মহারাজার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ▫

একটি নমস্কারে বলা হয়ে যায় অনেক কিছু

রণজিৎ গুহ

বঙ্গ সমাজে পারস্পরিক সাধারণ সম্ভাষণ রীতি হলো বুকের সামনে হাতজোড় করে নমস্কার বলা। শুধু বঙ্গ সমাজে কেন গোটা ভারতেই এমনকী এই দেশের সীমানার বাইরেও দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে এই সম্ভাষণ রীতিই প্রচলিত। নমঃ কথাটির অর্থ 'প্রণাম', 'অভিবাদন', 'সম্মাননা' বা 'নত হওয়া' এবং 'কার' কথার অর্থ 'কার্য' বা 'করা'। অর্থাৎ নমস্কার কথাটির আভিধানিক অর্থ হলো 'প্রণাম করা' বা 'সম্মান করা'। ভারতের কিছু অঞ্চলে অভিবাদনের এই রীতিটি নমস্কারের পরিবর্তে নমস্তে নামে পরিচিত। এই শব্দটিও একই সংস্কৃত শব্দ নমঃ থেকে এসেছে। এর অর্থ 'তোমাকে প্রণাম'। নম এবং তে (যুষ্মদ বা তুমি শব্দের ষষ্ঠীর একবচন রূপ) শব্দদ্বয়ের সন্ধিতে তৈরি হয়েছে শব্দটি।

ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় ভাষায় এই নমস্কার বা নমস্তের উচ্চারণ আলাদা আলাদা। কন্নড়ে একজন ব্যক্তিকে 'নমস্কারা' আর একাধিক 'নমস্কারাগলু' বলে সম্ভাষণ জানানো হয়। তেলুগুতে একজনের জন্য 'দণ্ডমু' বা 'নমস্কারম্' এবং একের বেশির ক্ষেত্রে 'দণ্ডালু' বা 'নমস্কারালু' বলা হয়। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক 'প্রণামমু' প্রচলিত। তামিলে নমস্কারকে বলা হয় ভানাক্কম বা 'বনক্কম'। এর উৎপত্তি 'বনঙ্গু' শব্দ থেকে, যার অর্থ সম্ভাষণ। মালয়ালম ভাষায় নমস্কারম্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

নমস্কার সম্ভাষণ আত্মীয়, অতিথি কিংবা আগন্তুককে স্বাগত জানাবার একটি রীতি। কারোর কোনো দান বা উপহার গ্রহণে বিনয় জানাতে, অথবা কোনো ব্যক্তির কৃপার প্রতি ধন্যবাদ জানাতেও নমস্কার ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু স্বাভিমানী ব্যক্তি নমস্কার জানানোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে এক ধরনের নতি স্বীকার নিহিত আছে মনে করেন। নমস্কার করা মানে যেন অবনত হওয়া। প্রাচীন ভারতের ঋষিকুল যদিও নমস্কার মুদ্রাটিকে প্রণামেরই অন্যতম প্রকাশ বলে নির্দেশ করেছেন কিন্তু প্রণামে যে সমর্পণের ইঙ্গিত নমস্কার মুদ্রায় তা সূচিত হয় না। মূলত অহম ত্যাগ করে বিনয়ভাব প্রকাশের জন্যই দুইহাত জোড় করা বা অঞ্জলি মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। বৈদিক শাস্ত্র বলছে 'যো দেবো অগ্নৌ যো অপসু যো বিশ্বং ভুবনাবিবেশ য ওষধীষু যো বনস্পতি তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।।' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২-১৭)

বৈদিক মতে যখন কাউকে নমস্কার জানানো হয় তখন মূলত সর্বজীবে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকেই প্রণতি নিবেদন করা হয়, কোনো মনুষ্যদেহকে নয়। সুতরাং নমস্কার সকলকেই জানানো যায়। সংস্কৃতিভেদে নমস্কারে কিছুটা বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন দেবতাদের উদ্দেশে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতে সাধকরা মাথার উপরে দু'হাত জোড় করেন। আবার কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতে নমস্কার জানাতে বুকের বরাবর হাত জোড় করেন।

এসব না হয় সনাতনী বা বৈদিক আচরণ। কিন্তু বঙ্গজীবনে এই বুকের সামনে হাতজোড় করে নমস্কার বলার সম্ভাষণ রীতি কবে থেকে এল? আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলে ছোটোরা বড়োদের পায়ে হাত দিয়ে নতমস্তকে প্রণাম জানায়। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে হাঁটু ছুঁয়ে শ্রদ্ধা সম্ভাষণ জানায়। হিন্দু মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণামের চল আছে। এই আনত হয়ে প্রণামের বদলে নমস্কার করার চলই এখন প্রায় সর্বক্ষেত্রে জনপ্রিয় ও মান্য সম্ভাষণ রীতি। এখন সনাতন ধর্মের অনুরাগীরা তাদের পূজ্য দেব-দেবীকেও জোড়হাতে নমস্কার করেন। আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতির যে বর্তমান রূপ রঙ্গ, সৌজন্য প্রকাশ থেকে শোক প্রকাশ, তার প্রায় সবটুকুই রবীন্দ্রভাবনার ফলশ্রুতি। হয় রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত না হয় রবীন্দ্রভাবনায় জারিত বা প্রভাবিত। তৎকালীন সুধীসমাজ অনুমোদিত এবং অনুশীলীত। এই নমস্কার রীতির জন্যও কি আমরা রবীন্দ্র ঋণে আবদ্ধ? 'গোরা' উপন্যাসে সুচরিতা বিনয়কে নমস্কার করছে, বিনয় প্রতি নমস্কার করছে। বিনয় পরেশকে নত হয়ে প্রণাম করে সুচরিতাকে নমস্কার করছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কি এই রীতির উল্লেখ আছে? হতে পারে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই রীতিটি জেনেছিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক— 'সহজ রচনাশিক্ষা'তে কেমন করে চিঠি লেখা উচিত সেটা বোঝাতে গিয়ে লিখেছিলেন, পূজ্য ব্যক্তিকে 'প্রণাম' করিতে হয়, তুল্য ব্যক্তিকে 'নমমস্কার' করিতে হয়। এই জন্য তুল্য ব্যক্তিকে যে পত্র লেখা যায়, তাহার পাঠের নাম 'নমস্কার' পাঠ। যথা— 'সবিনয় নমস্কারাঃ নিবেদনঞ্চ বিশেষং' অথবা বাঙ্গলায় 'বিনয় পূর্বক নমস্কার নিবেদন।' অনেকে সংক্ষেপ করিয়া শুধু লেখেন— 'নমস্কার নিবেদন।'

১৯০১ সালে ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ পাঁচজন ছাত্র নিয়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়িত্বে যে স্কুল খোলেন সেখানকার একটি সমস্যার সমাধানে রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক জীবনাচরণে এই নমস্কার রীতি চালু করেন। অন্য দুই শিক্ষক ছিলেন জগদানন্দ রায় ও কুঞ্জলাল ঘোষ। সমস্যা দেখা দিল ব্রাহ্মণ ছাত্র অব্রাহ্মণ শিক্ষক কুঞ্জবাবুকে কীভাবে পদ স্পর্শ করে প্রণাম জানাবে? রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিত নির্দেশ দিয়ে এই নমস্কার রীতিটি চালু করতে বলেন।

সম্ভবত শান্তিনিকেতন হয়ে এখন 'নমস্কার' বঙ্গজীবনের অঙ্গ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ সৌজন্য প্রকাশের নানা ধরনের পদ্ধতি আচরিত হয়। কোথাও করমর্দন কোথাও আলিঙ্গন, কোথাও বা চুম্বন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের এই নমস্কার জানানোর রীতি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম, আন্তরিক ও নিরাপদ। একটি মাত্র মুদ্রায় বহু অভিপ্রায় প্রকাশের অভিনব পদ্ধতি হলো নমস্কার জ্ঞাপন। ☐

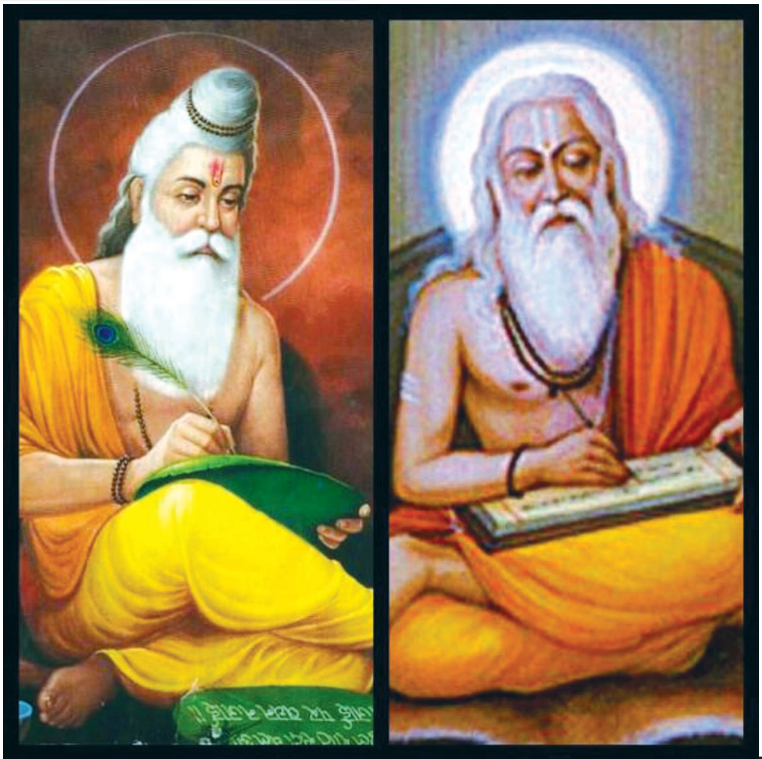

বাল্মীকি ও ব্যাস

ভারতের সংস্কৃত অলংকৃত মহাকাব্য

অমিতঘোষ দস্তিদার

'সর্গবন্ধো মহাকাব্য মুচ্যতে তস্য লক্ষণম্। অর্থাৎ সর্গ বা সমষ্টিগত শ্লোক দ্বারা নিবদ্ধ পদ্যই মহাকব্য। আচার্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মহাকাব্যের লক্ষণ নিরুপণ প্রসঙ্গে এমন কথা বলেছেন। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মহাকাব্য লক্ষণের উল্লেখ করে বলেছেন, 'সর্গবন্ধো মহাকাব্যম্' অর্থাৎ সর্গদ্বারা গঠিত পদ্যময় কাব্যবিশেষকে মহাকাব্য বলে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বীর্যগাথা বা শৌর্যের কাহিনির বাঙ্ময় প্রকাশকে বলে থাকেন এপিক অর্থাৎ মবাকাব্য। ইংরাজি Epic শব্দের বাংলা হলো মহাকাব্য। Epic শব্দটি গ্রিক Epos শব্দের বাংলা হলো মহাকাব্য। Epic শব্দটি গ্রিক Epos শব্দ থেকে গঠিত, যার অর্থ শব্দ বা সংগীত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এপিক বা মহাকাব্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন— Epic of growth, অর্থাৎ সাহিত্য ধর্ম মহাকাব্য এবং Epic of art অর্থাৎ কলাত্মক মহাকাব্য। পাশ্চাত্য বিচারে ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারত হলো সাহিত্য ধর্ম মহাকাব্য। ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাসের মহাকাব্য পাশ্চাত্য বিচারে হলো কলাত্মক মহাকাব্য। মহাকাব্যের এই দুই প্রভেদ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় বলেছেন— সাহিত্য ধর্ম মহাকাব্য বহু শতাব্দীর বহু ভাবধারায় পুষ্ট, বহু কবির রচনার সুসংহত রূপ। কলাত্মক মহাকাব্য একক কবির প্রয়াসের ফলশ্রুতি।

সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন— কবির, বিষয়বস্তুর, নায়কের বা অন্য কারো নামে মহাকাব্যের নামকরণ করতে হবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তির কথা উল্লেখ থাকবে। বস্তু, নেতা ও রস হলো মুখ্য অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং ওই তিনটি ব্যতিরেকে অন্য সব হলো গৌণ বা অপ্রয়োজনীয় বা আনুষ্ঠানিক লক্ষণ। মহাকাব্যে মুখ্য বা অন্তরঙ্গ লক্ষণগুলির সমাবেশ অপরিহার্য, কিন্তু গৌণ বা বহিরঙ্গ লক্ষণগুলির সবকটিই যে মহাকাব্যে থাকতে হবে, এমনটা নয়। তবে যে কটি গৌণ লক্ষণ ব্যবহার করা হবে তাদের বর্ণনা রসোত্তীর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হতে হবে। আচার্য দণ্ডী ও ভোজরাজও একই মত ব্যক্ত করেছেন। রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য। এই দুই বিশাল মহাকাব্যের প্রকৃত রচনাকাল চির রহস্যাবৃত। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে রামায়ণ ও মহাভারতের পূর্ববর্তী আদি ঋষি-কবি মহর্ষি বাল্মীকি ব্রহ্মার আদেশে দেবদুর্লভ রামচন্দ্রের দেবোপম চরিতকথাকে অবলম্বন করে রামায়ণ রচনা করেন। ঋষি-কবি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারত রচনা করেন। পৃথিবীর অন্য কোনো মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের মতো অন্য কোনো জাতির সমাজ ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে পারেনি। মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এক অপূর্ব সঙ্গমতীর্থ। ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, অধ্যাত্মচেতনার সমগ্রতা, ভারতের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ তত্ত্বকথা, নীতিমূলক উপদেশ ও অনুশাসন, কিংবদন্তী, উপাখ্যান, লোকবিদ্যা, প্রবচন, জীবনের নানা সংঘাত ও তার সমাধান, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যাবতীয় তত্ত্ব, ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজদর্শন ইত্যাদি সবকিছুর সমগ্রতায় পূর্ণ এই দুই মহাকাব্য।

রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। কাণ্ডগুলি হলো যথাক্রমে— বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড,

সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। ওই সাতটি কাণ্ড পাঁচশো অধ্যায়ে বর্ণিত। এই মহাকাব্যে মোট ২৪০০০ শ্লোক আছে। মহাভারত আঠারোটি পর্বে বিভক্ত। আঠারোটি পর্ব যথাক্রমে— আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, কর্ণ, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ। মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা শতসহস্র বা এক লক্ষ। তাই মহাভারত 'শতসাহস্রীসংহিতা' নামেও প্রসিদ্ধ। মহাভারত রচনার তিনটি স্তর হলো— জয়, ভারত, মহাভারত। ১৬ হাজার ৩৭৪টি শ্লোকে সংকলিত হরিবংশ পুরাণও মহাভারতের একটি অংশ বলে মনে করা হয়। মহর্ষি বেদব্যাস হরিবংশ পুরাণের বক্তা।

ব্যাস, বাল্মীকির পরে ভারতবর্ষে যিনি সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি হলেন ভারতের কবিকুল শিরোমণি সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস। কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। কেউ বলেন খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে উজ্জয়িনীরাজ শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালই কালিদাসের আবির্ভাবকাল। আবার কেউ বলেন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালই কালিদাসের স্থিতিকাল। আবার কেউ বলেন, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মালবরাজ যশোবর্মণের রাজত্বকালই কালিদাসের আবির্ভাবকাল। কালিদাস প্রায় ত্রিশটি গ্রন্থ লিখেছেন, তার মধ্যে কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ মহাকাব্য দুটি সংস্কৃত সাহিত্য জগতকে কালিদাস উপহার দিয়েছেন। সপ্তদশ সর্গে তরুণ বয়সে রচিত কুমারসম্ভব মহাকাব্যে মহাদেব এবং গিরিজানন্দিনী পার্বতীর মিলন ও কুমার কার্তিকের জন্মের সম্ভাবনা এই মহাকাব্যে সূচিত করা হয়েছে। ঊনবিংশতি সর্গে রচিত রঘুবংশ মহাকাব্য আজন্ম রঘুরাজগণের ধর্মানুমোদিত কীর্তি কাহিনি কালিদাসের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

৫৫০ খ্রিস্টাব্দের সন্নিহিত সময়ে আবির্ভূত মহাকবি ভারবি কালিদাসোত্তর যুগের মহাকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম একজন মহাকবি। অষ্টাদশ সর্গে মহর্ষি ব্যাসদেব কৃত মহাভারতের বনপর্ব এবং শিবপুরাণ থেকে বিষয় গ্রহণ করে, নবভাবে আলংকারিক মহাকাব্য হিসাবে 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' মহাকাব্য রচনা করে, লোকোত্তর খ্যাতি লাভ করেছিলেন ভারবি। ভর্তৃহরি রচিত প্রকীর্ণকাণ্ড, অধিকারকাণ্ড, প্রসন্নকাণ্ড রাবণবধ মহাকাব্য কালিদাসোত্তর যুগের অন্যতম এক বিখ্যাত মহাকাব্য। 'ভট্টি' শব্দটিকে 'ভর্তৃ' শব্দের প্রাকৃতরূপ বলে মনে করা হয়। ভর্তৃহরি কাব্যের মাধ্যমে ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্রের উদাহরণ-সহ মূলত ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্যই এই ভট্টিকাব্য রচনা করেছিলেন। ব্যাকরণ শিক্ষার উদাহরণের ভাণ্ডার হয়েও ভট্টিকাব্য বা রাবণবধ মহাকাব্য-মর্যাদায় আসীন হয়ে উঠতে পেরেছিল। টীকাকার মল্লিনাথ এই মহাকাব্যকে উদাহরণ কাব্য রূপে উল্লেখ করেছেন।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে কবি কুমারদাস কুমারভট্ট বা ভট্টকুমার রচিত জানকীহরণ মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করে। এই মহাকাব্য ২৫টি সর্গে রচিত। রামের জন্ম, সীতাহরণ, রাবণবধ ও রামের পুনরায় রাজ্যাভিষেক এই মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অলংকারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, চিত্রশিল্প, সংগীতবিদ্যা প্রভৃতিতে কবির পাণ্ডিত্যের প্রতিফলন ঘটেছে এই মহাকাব্যে। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে জানকীহরণ মহাকাব্যের প্রভূত খ্যাতি হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে মাঘ রচিত শিশুপাল বধ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম মহাকাব্যরূপে বিবেচিত হয়। কুড়িটি সর্গে এই মহাকাব্যটি রচিত। এই মহাকাব্যের আখ্যানভাগ মহাভারতের সভাপর্ব থেকে গৃহীত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মহাকাব্যের নায়ক এবং চেদিরাজ শিশুপাল হলেন প্রতিনায়ক। রুক্মিণীদেবীকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণ ও শিশুপালের বিরোধ এবং অবশেষে শিশুপাল বধ এই মহাকাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি অথবা দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরের কবি রাজানক রত্নাকরের হরবিজয় সংস্কৃত মহাকাব্যের মধ্যে বিশালায়তন। গ্রন্থটি পঞ্চাশটি সর্গে রচিত। শিব কর্তৃক অন্ধকাসুর নিধন এই মহাকাব্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কালিদাসোত্তর কালে প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ে রচিত মহাকাব্য সমূহের মধ্যে মহাকবি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীহর্ষ ১১৬৩-১১৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময় নৈষধচরিত মহাকাব্য রচনা করেন। নৈষধচরিত বাইশটি সর্গে রচিত শৃঙ্গার-রসোজ্জ্বল মহাকাব্য। মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত নলদময়ন্তীর আখ্যানভাগ এই মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়। সংস্কৃত অলংকৃত মহাকাব্যের শাখাকে অন্যান্য দাক্ষিণাত্যের রাজা কপ্‌ফিনের কাহিনি অবলম্বনে শিবস্বামী রচিত কপ্‌ফিনাভ্যুদয়। পঁচিশ সর্গে নিবন্ধ, শিব কর্তৃক ত্রিপুরাসুরের বিনাশের পৌরাণিক বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে মঙ্খক রচিত শ্রীকণ্ঠচরিত। এছাড়া হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত', চক্রকবির জানকীপরিণয়, দেবপ্রভ সুরির পাণ্ডবচরিত, কৃষ্ণানন্দের 'সহৃদয়ানন্দ', সোমেশ্বরের 'সুরথোৎসব' মহাকাব্য।

সংস্কৃত সাহিত্য কেবল ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক গৌরবোজ্জ্বল পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা, যার সূচনা হয়েছিল জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন জ্ঞানের মাধ্যমে। নানাবিধ জ্ঞানধারায় আজও অলংকৃত সংস্কৃত সাহিত্য। এই সাহিত্যধারার অন্যতম রূপ— মহাকাব্য হলো সময়ের দলিল যা উন্নত কলাবিদ্যা ও প্রগতিশীল সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। যুগযুগান্ত সঞ্চিত চিন্তাধারার সমস্ত স্রোত ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার মূল্যবান আকর হয়ে সংস্কৃত অলংকৃত মহাকাব্য আজও ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মচেতনার সামগ্রিকতা বজায় রেখে চলেছে। □

সরস্বতী পূজা ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার উদ্‌যাপন

পিন্টু সান্যাল

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে অর্থাৎ বসন্ত পঞ্চমীতে জ্ঞানের দেবীরূপে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। অনেক জায়গায় নবরাত্রি উৎসবের নবম দিনে মা সরস্বতীর আরাধনা হয়। বাঙ্গালিদের সরস্বতী পূজার সঙ্গে 'হাতে খড়ি' অর্থাৎ শিশুদের বিদ্যাচর্চা আরম্ভের অনুষ্ঠান হয় এবং দক্ষিণ ভারতে একই অনুষ্ঠান 'বিদ্যারম্ভ' নামে পালন করা হয়। ভারতীয় মননে সরস্বতী জ্ঞানের দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু নদী হিসেবে 'সরস্বতী'র গুরুত্ব বিস্মৃতপ্রায়। গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম হিসেবে বর্তমান প্রয়াগরাজের ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করা পুণ্য বলে বিবেচিত হয়। ত্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গা-যমুনার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হলেও সরস্বতীর অস্তিত্ব আজ শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যেই সংকুচিত। পৃথিবীর যে কোনো প্রাচীন সভ্যতা নদীনির্ভর ছিল এবং নদীর উপর নির্ভরশীলতা থেকেই যে নদীগুলি ভারতবর্ষে কালক্রমে 'মা'-এর মর্যাদা পেয়েছে তা সহজবোধ্য। বর্তমান ভারতবর্ষের নদী হিসেবে গঙ্গার গুরুত্ব বলাই বাহুল্য এবং এখন গঙ্গা 'মা' হিসেবে পূজিত হন। বর্তমানে অদৃশ্য হলেও সরস্বতী নদীর মাতৃরূপ এতো গুরুত্ব সহকারে দেশব্যাপী পূজিত হয় কিন্তু সেই নদীর উপর নির্ভরশীল সভ্যতা, এমনকী সেই নদীর ইতিহাস নিয়ে ইতিহাস বইগুলির নীরবতা অবাক করে।

ঋকবেদ সন্দেহাতীতভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋকবেদের বিভিন্ন সূক্তে ৭০ বারের বেশি সরস্বতী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই তুলনায় গঙ্গানদীর উল্লেখ আছে মাত্র একবার। এ থেকেই ঋক্‌বেদীয় যুগে সরস্বতী নদীর গুরুত্ব বোঝা যায়। ঋকবেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪১তম সূক্তের ১৬তম ঋকে বলা হয়েছে—

'অম্বিতমে নদিতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নসকৃধি।।'

অর্থাৎ মাতৃদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে সরস্বতী! আমরা সমৃদ্ধিহীনের ন্যায় রয়েছি, আমাদের সমৃদ্ধশালী করো।

নদীকে অন্নদাত্রী, বারিদাত্রী, সমৃদ্ধিদাত্রী হিসেবে বিভিন্ন ঋকে স্তুতি করেছেন ঋষি-কবিগণ। রোজকার জীবনের চাওয়া-পাওয়া জানিয়েছেন নদীরূপী 'মা'কে। শুধু স্তুতি নয় বেদ, মনুস্মৃতি, মহাভারত-সহ বিভিন্ন গ্রন্থে সরস্বতী নদীর অবস্থান ও গতিপথ বলা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে—

ফঃ ৫

'সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দে বনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।।'

অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই প্রশস্ত দেবনদীর মধ্যস্থলে যে সকল দেবনির্মিত দেশ অর্থাৎ প্রশস্ত দেশ আছে, সেগুলিকে ব্রহ্মাবর্ত বলে। বেদ রচিত হয়েছে ব্রহ্মাবর্তে অর্থাৎ ব্রহ্মার ভূমিতে। কুরুক্ষেত্র থেকে ব্রহ্মাবর্তের শুরু। কুরুক্ষেত্রের উত্তরের সীমান্ত সরস্বতী নদী এবং দক্ষিণের সীমান্ত দৃষদ্বতী নদী।

শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা অনুযায়ী,

'পঞ্চ নদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশেঽভবৎ সরিৎ।।' ৩৪ : ১১ অর্থাৎ আপন সহায়িকা নদীসমূহের সঙ্গে এই পঞ্চনদী সরস্বতী নদীতে সঙ্গমিতা হয়েছে। পাঁচটি নদী আপন নাম ত্যাগ করে সরস্বতীর নাম ধারণ করে নিয়েছে।

ঋকবেদের দশম মণ্ডলের ৭৫তম সূক্তে বলা হয়েছে—

'ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্নয়া মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া।।'

সূক্তের এই ঋকে পূর্ব থেকে পশ্চিম যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রী (শতদ্রু/শুতলেজ), পরুষ্ণী (রাবি, ইরাবতী), অসিক্নিয় (চেনাব, চন্দ্রভাগা), বিতস্তা (ঝিলম), আর্জিকিয় (হারো) নদীগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে যা এই সময়েও দৃশ্যমান একমাত্র সরস্বতী নদী ছাড়া। সরস্বতী নদী এই সূক্তে সুতলেজ (শতদ্রু) ও যমুনার মাঝে তৃতীয় নদী হিসেবে উল্লিখিত কিন্তু সেই সরস্বতী আজ নেই কেনো?

হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের আগে সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব নিয়ে ইউরোপিয়ান ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিকদের মনে কোনো সংশয় ছিল না, সংশয়ের সৃষ্টি করা হলো পরিকল্পিতভাবে একটি মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতে।

১৭৮৮ সালে অবিভক্ত বাঙ্গলার Surveyor General, James Rennel তাঁর 'Map of Hindoostan'-এ সরস্বতী নদীর গতিপথ দেখান। ১৮১২ সালে Colonel James Tod রাজপুতানার (বর্তমান রাজস্থান) লোকগীতিতে মরুভূমিতে জনসংখ্যা কমার কারণ হিসেবে ঘাগ্গর নদীর শুকিয়ে যাওয়ার গাথার উল্লেখ করেন। ফ্রান্সের ভূগোলবিদ Louis Vivien de Saint-Martin ১৮৬০-এ প্রকাশিত 'A Study on the Geography and the Primitive People of India's Noth-West, According to Vedic hymns'-এ ইংরেজদের করা সার্ভে এবং বৈদিক সূক্তের সাহায্যে ঘাগ্গর নদীকে বেদে উল্লিখিত সরস্বতী বলে প্রকাশ করেন। এরপর আমাদের সাক্ষী Major F Mackenson, যিনি ডাক ব্যবস্থা ও সৈন্য চলাচলের জন্য হরিয়ানার সিরসা থেকে বর্তমান পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তার খোঁজ করছিলেন। মেজর খুঁজে পেলেন একটি শুকিয়ে যাওয়া নদীর গতিপথ। এরপর ১৮৯৩ সালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর Surgeon-Major C.F Oldham তাঁর গবেষণাপত্র 'The Saraswati and the lost river of Indian Desert'-এ বলেন 'Although the confluence (with the Ghaggar) is marked in our maps as Ghaggar, it was formerly the Saraswati, that name is still known amongst the people.'

যে ঘাগ্গরকে এখানে ঋকবেদীয় সরস্বতীর মূল নদীখাত বলে উল্লেখ করা হচ্ছে সেটি এখন একটি মরশুমি নদী। শিবালিক পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে আসা মারকান্দ, সরসুতী ও চৌটাং (দৃষদ্বতী নদীর বর্তমান অবস্থা) ঘাগ্গর এর উপনদীগুলির মধ্যে অন্যতম। ঘাগ্গর হরিয়ানা থেকে রাজস্থানে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘাগ্গরের নদীখাত পাকিস্তানে হাকরা নামের একটি মরশুমি নদীর (Seasonal River) সঙ্গে যুক্ত। এই বিচ্ছিন্ন নদীখাত পুনরায় ভারতে প্রবেশ করে যা নারা নামের একটি মরশুমি নদীতে পরিণত হয়ে থর মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্ন ঘাগ্গর-হাকরা-নারা নদীখাতকেই বৈদিক সরস্বতীর গতিপথ হিসেবে ইংরেজ শাসনামলে নিঃসংশয়ে বিভিন্ন মানচিত্র ও গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর হলো সেই বিখ্যাত খননকার্য যার ভুল ব্যাখ্যা ভারতবর্ষের সঠিক ইতিহাসকে এখনো পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি।

১৯২৪ সালে জন মার্শাল Illustrated London News-এ 'First Light on a Long-forgotten Civilization : New discoveries of an unknown Prehistoric past in India' নামক গবেষণাপত্রে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর খননকার্য সংক্রান্ত তথ্য বিশ্বের সামনে আনেন। এর আগেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষার মধ্যে মিল ভাষাবিদদের নজরে আসে এবং এর উপর ভিত্তি করে ১৮৫০ সালে ম্যাক্সমূলার আর্য জাতির ধারণা কল্পনা করেন। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা ধ্বংস করে এবং বৈদিক সভ্যতার সূচনা করে যা আর্য-আক্রমণ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

সিন্ধু নদীর তীরে আবিষ্কৃত হওয়ায় হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োকে পরে 'সিন্ধু সভ্যতা' নাম দেওয়া হলো। কিন্তু এতদিনেও 'বৈদিক সভ্যতা'র এমন কোনো ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি যা বৈদিক ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে পার্থক্যকে স্পষ্ট রূপে তুলে ধরতে পারে।

সে সময় তথাকথিত 'সিন্ধু সভ্যতা'র সময়কাল ৩০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ বলে বিবেচিত হয়েছিল অর্থাৎ যিশুর জন্মের প্রায় ৩০০০ বছর আগে। ম্যাক্সমূলার-সহ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা নিজেদের উপাসনা-পদ্ধতি সংক্রান্ত বিশ্বাসে এতটাই আস্থাবান ছিলেন যে যিশুর জন্মের থেকে ৪০০০ বছর আগেও যে পৃথিবীতে কোনো সভ্যতার অস্তিত্ব থাকতে পারে তা তাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাই বৈদিক সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতার পরেই দেখাতে হতো। আর ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষার মিল থাকায় যদি এটা মেনে নেওয়া যেত যে ভারতীয় ভাষা থেকেই ইউরোপীয় ভাষাগুলি সৃষ্ট এবং ঋকবেদের সৃষ্টিকারী সভ্যতা সবথেকে প্রচীন ও ভারতবর্ষেই এর সৃষ্টি তাহলে তা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের জাত্যভিমানে এক বড়ো আঘাত হতো। আর আর্যদের বহিরাগত দেখাতে পারলে মূলরূপে ভারতবর্ষে কোনো জাতির অস্তিত্ব থাকে না এবং বেদ সৃষ্টিকারী আর্য থেকে শুরু করে ভারত আক্রমণকারী গ্রিক, হুন, মোগল, ইংরেজ, পর্তুগিজ সবাইকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করে দেওয়া যায় এবং ভারতবর্ষকে প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক সদা পরিবর্তনশীল ভূখণ্ড হিসেবে তুলে ধরা যায়— যেন এদেশের সৃষ্ট নিজস্ব কোনো সংস্কৃতিই

নেই। এই ধারণা ভারতীয়দের আপন সংস্কৃতি থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে শাসকের সংস্কৃতিকে আপন করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত করবে— এই ছিল পরিকল্পনা।

কিন্তু বেদকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বৈদিক সভ্যতার সময়কাল যদি প্রশ্নাতীতভাবে 'সিন্ধু সভ্যতা'র কয়েক হাজার বছর আগের বলে প্রমাণিত হয় তাহলে আর্য-আক্রমণ তত্ত্ব মুখ থুবড়ে পড়ে, এবং বেদভূমি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং এক প্রাচীনতম সভ্য জাতি হিসেবে ভারতীয়দের জাতীয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই কারণেই আর্য-আক্রমণ তত্ত্বকে নস্যাৎ করতে এবং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরিচয় বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে ঋকবেদে উল্লিখিত সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব ও তার সময়কাল খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বেদে উল্লিখিত হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল সরস্বতী নদীর জীবন গাথা বৈদিক সভ্যতা তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস।

ঋকবেদের সপ্তম মণ্ডলের ৯৫ সংখ্যক সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে বলা হয়েছে...

'একচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচিরয়তী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ।" (৭.৯৫.২)

অর্থাৎ এককভাবে জাগ্রত, শুদ্ধতম নদী, সরস্বতী পাহাড় থেকে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। মহাভারতের বনপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রা বর্ণনা করার সময় বিনাশন নামক স্থানে সরস্বতী নদীর অদৃশ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

'ততো বিনশনং গছেন্নিয়তো নিয়মাশনঃ।
গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মরুপৃষ্ঠে সরস্বতী।।' (৮২ : ১১১)

(অর্থ : তারপরে, শৌচ-সন্তোষাদির নিয়ম অনুসরণ করে এবং নিয়মিত খাবার গ্রহণ করে, বিনশানতীর্থে যান, যেখানে মরুর পিঠে থাকা সরস্বতী অদৃশ্য রূপ নিয়ে প্রবাহিত হন।) মহাভারতের সময়ের সরস্বতীর জলপ্রবাহ ঋকবেদের সময়ের সরস্বতীর প্রচণ্ড প্রবাহ থেকে ক্ষীণ হয়ে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মহাভারতের বন পর্ব ও শল্য পর্বের বিভিন্ন শ্লোকে ক্ষীণস্রোতা সরস্বতীর বিভিন্ন স্থানে অদৃশ্য (বিনাশন) হয়ে আবার দৃশ্যমান (চমশোধ) হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঋকবেদর সময় সরস্বতী নদী হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট একটি নিত্যবহ নদী কিন্তু মহাভারতের সময়ে এসে তা বৃষ্টির জলে পুষ্ট একটি মরশুমি নদীতে পরিণত হয়— ঋকদেব, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে সরস্বতীর এই ক্রমপরিবর্তন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হলেই বৈদিক সভ্যতার ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হয়। সরস্বতী সংক্রান্ত গবেষণার মূলত দুটি দিক— এক শুকিয়ে যাওয়া নদীখাতকে সরস্বতীর নদীখাত বলে প্রমাণ করা এবং দুই, সরস্বতী নদীর বিলুপ্ত হওয়ার কারণ ও তার সময়কাল।

কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন একটি নদী একদিন হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় না, বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে নদীকে জল সরবরাহকারী উপনদীগুলির নদীখাতের পরিবর্তন, ভূমিকম্প, জলবায়ুর পরিবর্তন অতি বৃষ্টি নদীর রূপ ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে থাকে। সরস্বতী নদীর ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। সরস্বতী নদীর জীবন ইতিহাসের

গবেষণার এক নিজস্ব 'ইতিহাস' আছে।

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রথম ডিরেক্টর জেনারেল অমলেন্দু ঘোষ দেখলেন বহু সংখ্যক হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ শুকিয়ে যাওয়া ঘাগ্গর-হাকরা নদীখাতে অবস্থিত এবং তিনি বিভিন্ন স্থানে শুকিয়ে যাওয়া ঘাগ্গর (সরস্বতীর বর্তমান নদীখাত)-এর ছবি তুললেন। শুরু হলো বৈজ্ঞানিকভাবে সরস্বতীর অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়াস।

এরপর এলো স্যাটেলাইটের যুগ। স্যাটেলাইটের সাহায্যে তোলা ছবির মাধ্যমে শুকিয়ে যাওয়া নদীখাতের নীচে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি জানা গেল এবং সেই থেকে বিভিন্ন সময়ে সরস্বতী ও তার উপনদীগুলির প্রাচীন নদীখাতের বর্ণনা পাওয়া গেল। ১৯৮০ সালে নাসার (NASA) LANDSAT স্যাটেলাইট এবং পরে ভারতীয় স্যাটেলাইট আইআরএস এর পাঠানো ছবি বিশ্লেষণ করে প্রাচীন নদীখাতগুলি আবিষ্কার করলেন পদ্মবিভূষণ প্রাপ্ত বিজ্ঞানী যশপাল ও অন্যান্যরা।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন, সাতরানার পর থেকে ঘাগ্গর (আদি সরস্বতী) প্রায় ৮-৯ কিলোমিটার চওড়া হয়ে যায় তার কারণ যমুনা নদীর প্রাচীন নদীখাত এখানে এসে ঘাগ্গর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি অনুযায়ী, উত্তরের দিকে বর্তমান শুতলেজ (শতদ্রু) নদীর প্রাচীন নদীখাত ঘাগ্গর এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখনো শুতলেজ (শতদ্রু)-কে বর্তমান রোপাড়ের কাছে হঠাৎ করে পশ্চিম দিকে ঘুরে যেতে দেখা যায়।

অথাৎ প্রাচীন সরস্বতী নদীর প্রবাহ যমুনা ও শতদ্রু নদীর জলে পুষ্ট হতো। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, উত্তর ভারতে টেকটনিক প্লেটের সরণের ফলে যে ভূমিকম্প হয়, তার ফলস্বরূপ শিবালিক পর্বতমালায়

চির ধরে এবং যমুনা নদীর পূর্বদিকের খাত সরে এসে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্যদিকে, উপগ্রহ চিত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শতদ্রু নদীর গতিপথ পশ্চিমদিকে সরে সরস্বতী নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর একটি টেকটনিক প্লেটের সরণের ফলে শতদ্রু (শুতলেজ), সিন্ধু নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৯৮৩-৮৫ সালে ভারত ও ফ্রান্সের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিকদের একটি দল হরিয়ানা ও রাজস্থানের ঘাগ্গর ও চৌটাং (প্রাচীন দৃষদ্বতী) নদীর ধূসর পলি পরীক্ষা করে যমুনা শুতলেজ (শতদ্রু)-এর পলির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রমাণ করেন। সরস্বতী নদী যমুনা ও শতদ্রুর বয়ে আনা হিমালয়ের বরফগলা জল না পেয়ে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল একটি নদীতে পরিণত হয়। বৃষ্টি কমার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার সরস্বতী ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে থাকে।

১৯৯৫ সালে BARC-এর দুজন বিজ্ঞানী S M Rao ও K M Kulkarni রাজস্থানের বিভিন্ন অংশে প্রাচীন নদীখাতের উপরে কুয়ো খনন করেন এবং ৫০-৬০ মিটার গভীরে পর্যাপ্ত মিষ্টি জলের সন্ধান পান কিন্তু স্যাটেলাইটের ছবি অনুযায়ী বালির নীচে অবস্থিত নদীখাত থেকে ১০০ মিটার দূরের কুয়োর জল অতি অল্প ও লবণাক্ত। তেজস্ক্রিয় ট্রিশিয়াম ডেটিং পদ্ধতিতে সেই জলের বয়স নির্ণয় করে জানা গেল তা প্রায় ৫০০০-৭০০০ বছর আগের যেসময় সেখানে বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। শুধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবির বিশ্লেষণ নয়, নদীখাতের গভীরে জমে থাকা জল ও পলির পরীক্ষা করে সরস্বতী নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও তার সময়কাল সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে।

সরস্বতী নদীর প্রাচীন নদী খাতের এই আবিষ্কার শুধুমাত্র বৈদিক সভ্যতার সঠিক ইতিহাস খুঁজে পেতেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, সরস্বতী-গবেষণা হরিয়ানার শুষ্ক অঞ্চল এবং রাজস্থানের বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলের জল সমস্যা দূরীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ। গুজরাটের কচ্ছের রানে সরস্বতীর পুরনো নদীখাতের আবিষ্কার সেনা জওয়ানদের জলের অভাব পূরণ করবে।

সিন্ধু নদীর তীরে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হওয়ার পর ১৯৫৫ থেকে আজ অবধি লোথাল, কালিবাঙ্গান, ধোলাভিড়া, রাখিগাড়ি-সহ প্রায় ২৭০০ স্থানে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে যা মোট প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের ৬০ শতাংশ এবং সরস্বতীর হারিয়ে যাওয়া নদীখাতের ধারে অবস্থিত। তাহলে এতদিন আমরা যাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' নামে জেনে এসেছি তার নাম হওয়া উচিত 'সরস্বতী-সিন্ধু সভ্যতা' কারণ এই সভ্যতা মূলত সরস্বতী নদীর উপর নির্ভরশীল ও সরস্বতীর ধারেই গড়ে উঠেছিল।

সরস্বতী-সিন্ধু নদীর তীরের ধ্বংসাবশেষকে বিশ্লেষণ করে একই ধরনের নগর পরিকল্পনা, রাস্তা ও অন্যান্য নির্মাণের পরিমাপ, ওজন ও দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক শুল্বসূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'তে উল্লিখিত পরিমাপ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক বি বি লাল-এর মতে কালিবাঙ্গানের ধ্বংসাবশেষে টেরাকোটার গৃহ নির্মাণের পদ্ধতি প্রায় ৪৫০০ বছর পরেও ওই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। 'সরস্বতী-সিন্ধু' সভ্যতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় চিহ্ন যেমন স্বস্তিকা, যজ্ঞবেদী, অগ্নির উপাসনা, বিভিন্ন যোগাসনের মূর্তি বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে 'সরস্বতী-সিন্ধু' সভ্যতার পার্থক্যের সম্ভাবনাকে অকল্পনীয় করে তোলে। সাম্প্রতিক গবেষণা ভিরানা-সহ একাধিক স্থান থেকে প্রাপ্ত শিল্পকর্মের রেডিয়ো কার্বন ডেটিং প্রমাণ করে সরস্বতী-সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল প্রায় ৯০০০ বছর আগের। IIT Bombay ও PRL Ahmedabad-এর গবেষণা অনুযায়ী এই সময়ে সরস্বতী নদী একটি বৃষ্টির জলে নির্ভরশীল নদীতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ঋকবেদে বর্ণিত হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট সরস্বতী নদীর এ অনেক পরের অবস্থা। 'Science Report' পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রটির মতে সরস্বতী নদী আজ থেকে প্রায় ৮০০০০ বছর থেকে ২০০০০ বছর আগে পর্যন্ত একটি নিত্যবহ নদী ছিল। এরপর শেষ হিমবাহ যুগের শুষ্কতার জন্য সরস্বতী নদীর জলপ্রবাহে টান পড়ে। তারপর অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য সরস্বতী বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে নিজের শক্তি ফিরে পায়।

সরস্বতী নদীর জীবনকে প্রধানত পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

(১) হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট নিত্যবহ ঋকবেদীয় সরস্বতী। (২) সরস্বতী নদী থেকে যমুনার বিচ্ছিন্ন হওয়া। (৩) সরস্বতী থেকে শতদ্রুর (শুতলেজ) বিচ্ছিন্ন হওয়া। (৪) অতি বৃষ্টির জন্য সরস্বতীর জলপ্রবাহ বৃদ্ধি যা আজ থেকে প্রায় ৯০০০-৪০০০ বছর আগের ঘটনা। (৫) এরপর শুষ্ক জলবায়ুর জন্য সরস্বতীর শুকিয়ে যাওয়া ও ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জলাশয়ে বিভক্ত হয়ে অদৃশ্য হওয়া।

সরস্বতীর জীবনের এই চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ের মাঝেই 'হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তনে অনাবৃষ্টির ফলে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী-সিন্ধু সভ্যতার স্থানগুলিকে ক্রমশ উত্তর-পূর্বে সরতে দেখা যায়। গবেষণা যত এগিয়েছে সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব এবং সরস্বতী নদীর উপর নির্ভরশীল বৈদিক সভ্যতার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এরপরেও একশ্রেণীর ঐতিহাসিক নিজেদের মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে সত্য স্বীকার করতে চান না, তারা পুরনো আর্য-অনার্য তত্ত্বের পক্ষে হাস্যকর যুক্তি তুলে ধরেন। ভারতবর্ষের ১২০০০ বছরের থেকেও বেশি নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক ও প্রমাণ সরস্বতী নদী। সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব ঋকবেদ, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ ও মহাভারতকে ভারতবর্ষের ইতিহাস হিসেবে প্রমাণ করে। যে নদীর ধারে বসে প্রাচীন ঋষিগণ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থের শ্লোক রচনা করেছিলেন, শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চা করেছিলেন, পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার ভিত তৈরি করেছিলেন সেই নদী যে 'মা' হিসেবে, 'জ্ঞানের দেবী' হিসেবে পূজিত হবেন এটাই তো স্বাভাবিক।

তাই সরস্বতীপূজা বিশ্বের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের, ভারতবর্ষের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এবং এক সুস্পষ্ট জাতীয়তার উদ্‌যাপন। মা সরস্বতীর এক হাতে বেদ যেন সেই সভ্যতা, তার ইতিহাস ও জাতীয়তার প্রমাণ এবং অন্য হাতে সমস্ত বিভেদকামী মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যতান সৃষ্টিকারী 'বীণা'। □

ধর্ম ও বিকৃতির ঊর্ধ্বে শুভ্রতায় মোড়া দেবী সরস্বতী

নিখিল চিত্রকর

১৯৯৯ সালের কথা। পিতৃবিয়োগের পর হুগলীর একটা স্কুলে ভর্তি হতে হলো। সিঙ্গুর পেরিয়ে দুর্গাপুর হাইওয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো গ্রামের স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলাম। এক শীতের দুপুরে সহপাঠীদের মুখে শুনলাম এই স্কুলে সরস্বতী পুজো হয় না! অবাক হলাম। প্রসঙ্গত, স্কুলের বেশিরভাগ পড়ুয়াই ছিল এক বিশেষ সম্প্রদায়ের। প্রধান শিক্ষকও তাই। আমার 'কেন হয় না?' প্রশ্নের জবাবে কেউ একজন বলেছিল, 'ও তো হিঁদুদের পুজো! মুসলমান ইস্কুলে ওসব হয় না!' ভারী অবাক হয়েছিলাম। খাস মধ্য কলকাতার ছেলে আমি। মা সরস্বতীর আরাধনায় কোনওদিন ধর্মের দোহাই শুনিনি। এটুকুই বুঝতাম, মা সরস্বতী বিদ্যার দেবী। তাঁর আরাধনা করলে ছাত্রজীবনে সাফল্য মেলে। দুবছর সেই স্কুলে পড়ার সময় শিক্ষকদের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করে সরস্বতী পুজো করার চেষ্টা চালিয়েছিলাম। কিন্তু সেসব ধোপে টেকেনি! বিদ্যাদেবীর বন্দনার ইচ্ছায় সেই প্রথম ধাক্কা আরও তীব্র হয়েছে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। যখন দেখেছি, তাবড় শিল্পী-সাহিত্যিকরা কখনও ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে, আবার কখনও কুরুচির পঙ্‌ক্তিতে বিদ্যার দেবীকে লাঞ্ছিত করছেন।

চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের কথাই ধরা যাক। খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে তিনি দেবী সরস্বতীকে নিয়ে বিকৃত ছবি আঁকলেন। মকবুল জানতেন না ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এভাবে দেখে দেশ জুড়ে পড়ুয়ারা প্রতিবাদে নামবেন। ভারতের মতো দেশে উদারবাদী মানসিকতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভারতের সংখ্যাগুরু সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসে একতরফা আঘাত করেও শুধুমাত্র 'শিল্পীর স্বাধীনতা' অথবা 'সংখ্যালঘু' তাস খেলে বারবার ছাড়া পেয়ে যায় এরা। মকবুল ফিদা হুসেনও হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবনায় আঘাত করেও পার পেয়ে গেছেন। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর বিকৃত উপস্থাপনা করে 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র মেকি যুক্তি দিয়েছেন।

দেবী সরস্বতীকে নিয়ে বিকৃত মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও। তাঁর 'অর্ধেক জীবন' উপন্যাসে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নিয়ে কামনা-বাসনার যে বিকৃত মনোভাব বর্ণিত করেছেন তা ইতরশ্রেণীর নীচ রুচি। ভাবতেই লজ্জা লাগে যে, এই ধরনের স্থূল ভাবনা কীভাবে একজন সমাজ সচেতন সাহিত্যিকের মাথায় আসে! অশ্লীলতারও সীমা থাকে। এগুলো আসলে এক প্রকার বিকার। সমস্যাটা বিকৃত স্রষ্টার নিজের, তার দৃষ্টির, তার মানসিকতার, তার বেড়ে উঠার, আর সবশেষে তার শিক্ষার। এখানে শিক্ষার থেকে বড়ো ধর্ম আর নেই।

'পদ্মপুরাণে' উল্লিখিত 'সরস্বতীস্তোত্রম্'-এ বর্ণিত হয়েছে,—

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা।।
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা।
শ্বেতাবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা।। ২

অর্থাৎ দেবী সরস্বতী শ্বেতপদ্মে আসীনা, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা এবং শ্বেতগন্ধে অনুলিপ্তা, হাতে শ্বেত রুদ্রাক্ষের মালা; তিনি শ্বেতচন্দনে চর্চিতা, শ্বেতবীণাধারিণী, শুভ্রবর্ণা এবং শ্বেত অলংকারে ভূষিতা। বিদ্যাদাত্রী দেবীর পূর্ণ সজ্জা থেকে শুরু করে নৈবেদ্য পর্যন্ত পুরোটাই শাশ্বত শুভ্রতায় মোড়া। এই দেবীর প্রতিমাই অশ্লীল দর্শন পারভার্সানের নামান্তর।

সরস্বতী হলেন জ্ঞান, শিল্পকলা, সংগীত, বুদ্ধি ও বিদ্যার দেবী। বৈদিকযুগ থেকে তিনি ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ দেবী হিসেবে পূজিত হয়ে আসছেন। এক হাতে পুস্তক ও এক হাতে বীণা। তার হাতে বীণা থাকায় তাকে বীণাপাণি বলা হয়। এছাড়াও তিনি শ্রুতদেবী নামেও কথিত হন। স্কন্দপুরাণ, মহাপুরাণ, দেবীভাগবত পুরাণ ও শুক্ল যজুর্বেদে এভাবেই দেবীর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ, প্রথম শ্রেণীর একটি বাংলা দৈনিকের অনলাইন সংস্করণে (৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১) দেবাশীষ পাঠক তাঁর 'শুধু কি বিদ্যার দেবী? কৃষি সভ্যতা থেকে নিষিদ্ধপল্লী, প্রেম থেকে প্রজনন— বন্দিত তিনি'— শীর্ষক লেখায় এক জায়গায় লিখেছেন, '...সে সব সরিয়ে রেখে সাদা চোখে দেখলেও কিন্তু দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। এক, সরস্বতী বাগ্‌দেবী। দুই, তিনি মূলত পূজিতা হতেন পতিতাপল্লীতে।' এত অনর্থক বৃত্তান্ত টেনে বারবার বিদ্যার দেবীকে এমন কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস কেন?

মা সরস্বতী বিদ্যার দেবী। পড়ুয়াদের দুনিয়ায় তাঁর এই অধিষ্ঠানই সর্বোপরি থাক। বিতর্ক তৈরি করে প্রচারের আলোয় আসার বাসনায় দেব-দেবীদের অবতারণা এবার বন্ধ হোক। ◻

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

যুবকটিকে নিয়ে কী করা যায় প্রতিবেশীরা বুঝতে পারছিলেন না। ইনি একজন অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক একথা সবারই জানা ছিল। তিনি তাঁর বাড়ির ছোটো গবেষণাগারে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন, এও তাঁরা জানতেন। কিন্তু কসাইখানা থেকে নিয়ে এসে জন্তুর হাড়গোড় জড়ো করার মধ্যে কী এমন বৈজ্ঞানিক রহস্য থাকতে পারে, তা তাদের মাথায় এল না। একেই তো ওই গবেষণাগার থেকে নানারকম দুর্গন্ধ ভেসে আসে, তার ওপর পচা হাড়-মাংসের গন্ধ সবার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ছাদ থেকে হাড়গোড় তুলে নিয়ে কাক-চিল আশেপাশের বাড়িতে ছড়াতে লাগল। এবার আর সহ্য করতে না পেরে তাঁরা যুবকটিকে বললেন যে, যদি সে এখান থেকে হাড়গোড় না সরায় তাহলে মিউনিসিপ্যালিটির লোক ডেকে ওগুলো পরিষ্কার করানো হবে। যুবকটি মহা ফ্যাসাদে পড়লেন। ঠিক ওই সময়ে তাঁর এক বন্ধু এসে তাঁকে বাঁচালেন। লোকালয় থেকে দূরে ওই বন্ধুর একটি খালি জমি আছে, সেখানে ওই হাড়গোড় রাখতে বললেন। সেখানে যুবকটি দেখলেন যে রোদে হাড়গুলো ভালোভাবে শুকিয়ে গেছে, তখন একদিন সন্ধ্যায় তিনি আগুন জ্বালিয়ে হাড়গুলো পোড়াতে বসলেন। আবার ফ্যাসাদ বাঁধল। আগুন দেখে পুলিশ ছুটে এল। অতি কষ্টে তিনি বোঝালেন যে এগুলি মানুষের হাড় নয়। পরদিন সকালে সেই হাড়পোড়া ছাই গবেষণাগারে নিয়ে এসে সালফিউরিক অ্যাসিডে দিলেন। এইভাবে তৈরি সুপার ফসফেট অব লাইম সোডার সঙ্গে মিলিয়ে ফসফেট অব সোডার দ্রব তৈরি করলেন। দ্রবটি একটি গামলায় ঢেলে ফোটাতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই গামলার মধ্যে দলা দলা ফসফেট অব সোডার স্ফটিক দেখা গেল। যুবকটি একটি দলা মুখে দিয়ে চিবিয়ে খুব খুশি হলেন। কারণ এইভাবে তিনি পশুর হাড়গোড় যা সাধারণত ফেলে দেওয়া হয় তার থেকে এমন একটি ওষুধ সংমিশ্রণ তৈরি করেছেন যা থেকে স্নায়ুতন্ত্রের বলবর্ধক ওষুধ তৈরি করা যায়।

যুবকটি এই বলবর্ধক ঔষধটি প্রচুর পরিমাণে তৈরি করতে শুরু করলেন। বিদেশ থেকে

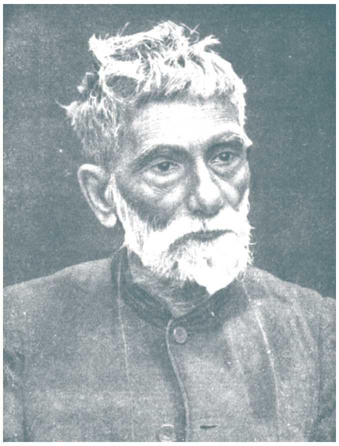

আমদানি করা এই রকমের ওষুধের চেয়ে তাঁর তৈরি ওষুধ অনেক সস্তা দামে কিন্তু গুণের দিক দিয়ে সমান। প্রথম দিকে ওষুধের দোকানদাররা এই দেশীয় ওষুধ রাখতে চাইছিল না। কিন্তু যে সমস্ত ডাক্তার এই যুবককে জানতেন এবং এই ওষুধের কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তাঁরাই এই ওষুধের প্রচার করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে এটি খুব জনপ্রিয় হলো।

এইভাবে খুব ছোটো আকারে বেঙ্গল ক্যামিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এই কোম্পানি দেশের বৃহত্তম রাসায়নিক উৎপাদকের অন্যতম হয়ে দাঁড়ায়। এই যুবকটির নাম প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। আজ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দেশের রাসায়নিক শিল্পের জনক বলে পরিচিত। তিনি যে শুধু গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও অনেক প্রতিভাবান যুবা রাসায়নিক সৃষ্টি করেছেন তা নয়, তিনি মৌলিক গবেষণার দ্বারা রসায়নের ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের উচ্চাসনের অধিকারী করেছেন। একশো বছর আগের ভারত বর্তমান থকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। ওই সময় দেশে শিল্প ছিল না বললেই হয়। ইংরেজরা তাদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখান থেকে সমস্ত কাঁচামাল তাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি করত আর বেশি দামে বিক্রি করার জন্য তৈরি মাল এদেশে আমদানি করত। ফলে এদেশের মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ল ও বিদেশি মালে বাজার ভরে গেল।

১৮৮৮ সালে পি সি রায় এডিনবার্গ থেকে ডিএসসি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলেন। দেশের অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি বিদেশি পোশাক ত্যাগ করে খদ্দর পরা শুরু করলেন। দেশে শিল্পের বিস্তার করার জন্য মনস্থির করলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ পেলেন। বেতন খুব সামান্য। সেই বেতনের থেকে সাধ্যমতো সঞ্চয় করতেন যাতে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পুঁজি জমানো যায়। অবসর সময়ে তিনি বাড়িতে গবেষণাগারে নানারকম পরীক্ষা করতেন। লেবু ও বাতাবিলেবু থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করলেন কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, কারণ লেবুর দাম অনেক বেশি অথচ সাট্রিক অ্যাসিড বাজারে অনেক সস্তা। তিনি বইয়ে পড়েছিলেন যে সালফিউরিক অ্যাসিড শিল্পের জননী, সেজন্য এই অ্যাসিড তৈরি করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি আবার বিফল হলেন। তখন সোডার ফসফেট তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করল। তিনি গবাদি পশুর হাড় থেকে এই রাসায়নিক দ্রব্যটি তৈরি করতে সক্ষম হলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প খুবই উন্নতি করল। শুধু তাই নয়, তাঁর দেখাদেখি অনেকে তাঁর পথ অনুসরণ করলেন এবং দেশীয় শিল্পের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে লাগল। ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দেশের স্বাধীনতা ছাড়া তাঁর সমস্ত স্বপ্নই রূপায়িত হয়েছিল।

১৮৬১ সালে ২ আগস্ট পূর্ববঙ্গের রাড়ুলী-কাটিপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে তাঁর জন্ম। বেংজামিন ফ্রাংকলিনের জীবনী পড়ে সাহিত্য থেকে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায়। তিনি অকৃতদার ছিলেন। বন্ধু ও ছাত্রদের সঙ্গেই থাকতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হলেও তিনি এক সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একপয়সাও খরচ করতেন না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা দুঃস্থ ও গরিবদের সেবায় দান করেছেন। ১৮৯৬ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর রচিত ‘ দি হিস্টোরি অব হিন্দু কেমেস্ট্রি’ বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ডি এম সালভি

ভারতের বিপ্লবী

নরেশ রায়

বিপ্লবী নরেশ রায় পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহের নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম গিরিশচন্দ্র রায়। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করেন। চারদিন পর ২২ এপ্রিল ১৯৩০ সালে জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ দেন। এই যুদ্ধে ১৪ জন বিপ্লবীর প্রাণ বলিদান করেন।

জানো কী?

- ভারতের শস্যাগার বলা হয় পঞ্জাবকে।
- কলকাতা মেট্রোরেল চালু হয় ১৯৮৪ সালে।
- আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনীর নাম 'ঝাঁসি রানি ব্রিগেড'।
- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে আধুনিক ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয়।
- ভারতীয় সংবিধানের ২৪ আর্টিকেলে কারখানায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধ।
- চিত্তরঞ্জন দাশের বিখ্যাত উক্তি ' এডুকেশন ক্যান ওয়েট, স্বরাজ ক্যান নট'।

ভালো কথা

সাথী হারা

সেদিন ছিল আমার স্কুলে যাওয়া প্রথম দিন। দিদির সঙ্গে যাচ্ছিলাম। অচেনা রাস্তা। রাস্তার ধারে বটগাছের তলায় বসে থাকা এক বৃদ্ধা ভিখারিণীকে দেখলাম। জুল জুল করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কিছু চাইছে। আমার মনটা দুঃখে ভরে গেছিল। মায়ের দেওয়া টাকাটি আমি তার হাতে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে প্রতিদিনই তার হাতে কিছু না কিছু দিই। এখন আমি বড়ো হয়ে গেছি। একা একা স্কুলে যাই। বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে তার সঙ্গে গল্প করি। আমার সঙ্গে গল্প করে সেও খুব খুশি হতো। সেদিন স্কুলে যাবার পথে বটতলায় এসে থমকে দাঁড়াই। দেখি সেই বৃদ্ধা আর নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। মনটা দুঃখে ভরে গেল। মনে হলো আমার কাছের সাথী যেন আমাকে ছেড়ে বহুদূর চলে গেছে।

প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, নবম শ্রেণী, মাদপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

কবিতার চেষ্টা

রাজশ্রী ঘোষ, একাদশ শ্রেণী, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড

মা বলে কবিতা লেখ
আমি বলি পারি না,
বাবা বলে যা কিছু লেখ
আমি বলি পারি না।
মা-বাবার কথা মেনে
বুধবারের শুভদিনে
বসে গেলাম লিখবো বলে
লিখে ফেললাম যা এল মনে।
মা বলল পাঠিয়ে দে
আমি বললাম হয়নি যে,
বাবা বলল দেখি তবে
ধীরে ধীরে হবে সবে।
পাঠিয়ে দিয়ে স্বস্তিকাতে
বসে থাকি হাপিত্যেশে
কবে ছাপবে নবাঙ্কুরে
মনটি আমার উঠবে ভরে।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

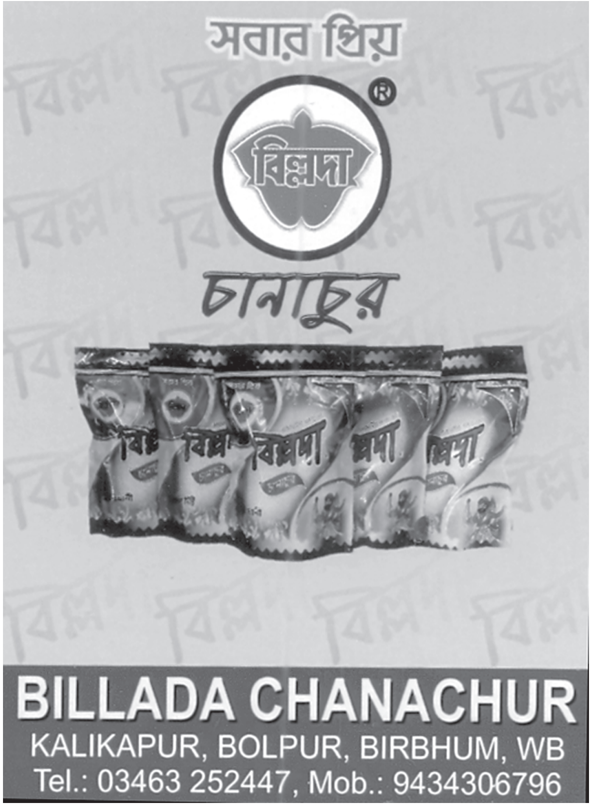

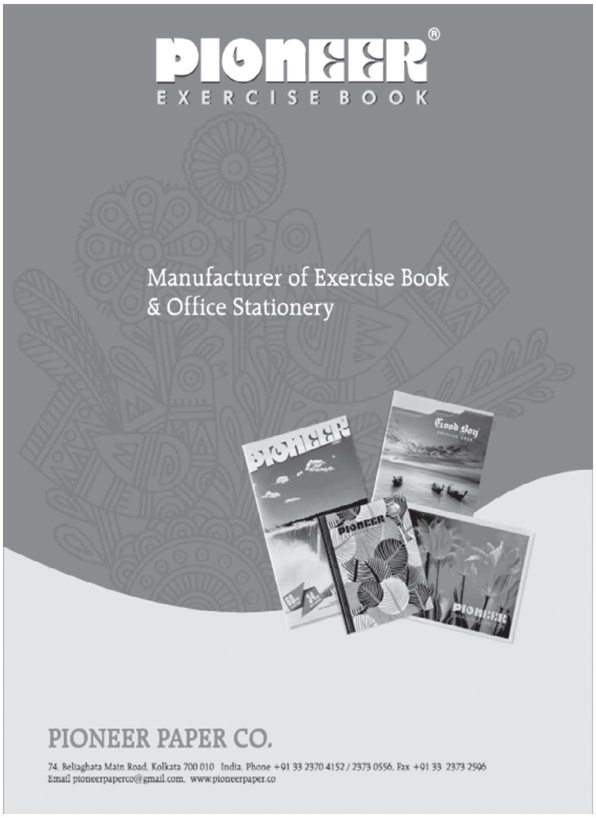

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

এশিয়াটিক সোসাইটিতে জাতীয় গণিতদিবস উদ্‌যাপন

সৌমেন নিয়োগী

পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ২০১২ সালে বিশ্ববরেণ্য ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজমের ১২৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২২ ডিসেম্বর দিনটিকে জাতীয় গণিতদিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশব্যাপী যে অমৃত মহোৎসবের আয়োজন করেছে, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে শ্রী নিবাস রামানুজমের জন্মদিনে ভারতীয় গণিত গরিমা উপস্থাপন হেতু 'Manuscripit on Ganitsastra' শীর্ষক এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের অবদান থেকে শুরু করে বেশ কিছু প্রাচীন গণিত শাস্ত্রের লিপি প্রদর্শন করা হয়। যেমন— আর্যভট্টীয় (৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ), রঘুনন্দনের গ্রহকগল্পতরু (১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ), ভাস্করাচার্যের লীলাবতী ও লঘু গণিতম্ ইত্যাদি।

প্রাচীন গণিত শাস্ত্রের লিপিগুলি সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক প্রদীপ মজুমদার। তাঁর আগে শ্রীনিবাস রামানুজমের কর্মজীবনের ওপর আলোকপাত করেন সভার বিশিষ্ট জনেরা। এই অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রাচীনযুগ থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় গণিতবিদদের অবদান বিষয়ে এক অত্যন্ত মনোজ্ঞ বক্তব্য স্লাইডের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন 'Indian Statistical Institute, Kolkata'র অধ্যাপক অর্মত্যকুমার দত্ত। অধ্যাপক দত্ত তাঁর নিবন্ধটি উপস্থাপনের পূর্বে বিশেষ ভাবে গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজমের উপর এক অজানা তথ্য ও তাঁর বিশেষত্বের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে শ্রীনিবাস রামানুজমের গণিত প্রতিভাকে বিশ্বের কাছে উন্মোচিত করেছিলেন অধ্যাপক Hardy। তৎস্বরূপ তিনি তাঁর গণিত প্রতিভার সামান্যই জানতেন যা বিগত শতাব্দী থেকে শুরু করে

বর্তমান সময়ে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। অধ্যাপক Hardy শ্রীনিবাস রামানুজমকে Euler, Jacobi প্রমুখ গণিতবিদের মতোই চিন্তা করেছিলেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গণিতবিদদের আধুনিক নাম্বার থিয়োরির উপর সাফল্যের পিছনে রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে রামানুজমের প্রভাব যা কখনই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যখন দেখি রামানুজমের কাজের উপর ভিত্তি করেই 'Wails anjecture', Fermat's Theorem' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গণিত তত্ত্বের নির্মাণ ও সমাধান। এই সম্পর্কে প্রখ্যাত গণিতবিদ Seilburg ও Ken-Quo-র উক্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। Seilburg বলেছেন শ্রীনিবাস রামানুজমের গণিত তাঁর কাছে এক রহস্য ও তাঁর কাজ তাঁকে একজন গণিতবিদ হিসেবে পরিণত হতে একান্ত ভাবে সাহায্য করেছে এবং তিনিই অধ্যাপক Herdy-র পুরাতন ধারণাকে ধূলিসাৎ করে শ্রীনিবাস রামানুজমকে গণিত বিশ্লেষক হিসাবে না রেখে বরং বীজগণিতবেত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার গণিতবিদ Ken-Quo ব্যক্ত করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপান ১৯৫৫ সালে এক গণিতের মহাসম্মেলনে মার্কিন গণিতবিদ Andrew Wailes-এর অনুপ্রেরণায় জাপানিদের গণিতে উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীনিবাস রামানুজমকে উপস্থাপন করেছিলেন যা জাপানিদের গণিত চর্চায় এক অগ্রগণ্য ভূমিকা নিতে সাহায্য করে। সত্যই অধ্যাপক দত্ত এক নতুন তথ্যের দিশা দিলেন যা ভারতীয় মনীষাকে আমাদের নতুন ভাবে ভাবতে সাহায্য করবে।

শ্রীনিবাস রামানুজমের জীবনালেখ্য উন্মোচনের করে অধ্যাপক দত্ত বক্তব্য রাখতে শুরু করেন ভারতীয় গণিতের অবদানের ঐতিহাসিক রূপরেখা এবং তা কীভাবে বর্তমানকালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথমেই তিনি বাঙ্গালির প্রাচীন ও বৈদিক গণিতচর্চার বিষয়ে সর্বত্রই এক নেতিবাচক মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন এবং মূল আলোচনায় প্রবেশ করেন বৈদিক যজ্ঞ বেদীর নির্মাণ কৌশল উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণার কথা দিয়ে। বৈদিক ঋষিদের কাছে আধ্যাত্মিক অন্বেষণের মূলেই ছিল তাঁদের জ্ঞানস্পৃহা এবং তা নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করাই ছিল তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য। যার ফলে যজ্ঞের জন্য নির্মাণ করতেন বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞবেদী যার কেন্দ্রে ছিল গণিত এবং সেই গণিতই হলো 'শুল্বসূত্র'। উদাহরণ স্বরূপ যেমন শ্যেণচিৎ যজ্ঞবেদী।

আমরা স্কুলে জ্যামিতিতে সকলেই পিথাগোরাসের উপপাদ্য পড়েছি। বস্তুত শুল্বসূত্রের মধ্যে রয়েছে পিথাগেরাসের উপপাদ্যের ব্যবহার। শুল্বসূত্রের ব্যবহার অতি সুক্ষ্ম ও উচ্চমানের, আবার পিথাগেরাসের বহুযুগ আগে। বৈদিক জ্যামিতিক অঙ্কনকে হতে হবে নির্ভুল এবং কোনো এক সরলরেখাকে সমানভাবে বিভক্ত করতে ব্যবহার করতে হয় কম্পাসের, স্কেলের নয়। এই ধরনের জ্যামিতিক অঙ্কন প্রণালী বেদে প্রমাণিত যা Eudid (৩০০ খ্রি.পূ.) পরে ব্যবহার করেন। ফলে বীজগণিতকে জ্যামিতির আকৃতিতে এক অত্যন্ত চাতুরীর মাধ্যমে প্রয়োগ হয়েছে

ফঃ ৬

পিথাগোরাসের উপপাদ্যে যা কিনা বৌধ্যায়নের শুল্বসূত্রেরই এক অনুবাদ। পিথাগোরাসের উপপাদ্য ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বেও ব্যবিলোনিয়া প্রভৃতি সভ্যতায় দেখা গেলেও ৮০০ খ্রিস্টপূর্বে বৌধ্যায়নের শুল্বসূত্রের যে চাতুরতা তা কখনোই তাতে ছিল না, এটাই হলো প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদের এক অপরিসীম কীর্তি। তাঁরা কোনোরকম মাপজোপ বা নিকটস্থ সঠিক মান না ধরেই √n বা √ab জ্যামিতিক অঙ্কন দিয়েই তাদের মান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানেই রয়েছে সাফল্যের এক অমোঘ দিক যা কিনা বীজগণিতীয় সূত্রের জ্যামিতিক মুখাবয়ব, সূত্র কোনো চিহ্ন নয় বরং কিছু প্রকাশ করে যা কিনা বীজগণিতের সূত্র কিন্তু জ্যামিতিক এবং এটি প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা উদাহরণের ব্যবহার না করে হয়েছিলেন ব্যতিক্রমী অর্থাৎ Orbitary। যাঁরা সমালোচক তাঁরা যতই সমালোচনা করুক না কেন এই সূত্রবিহীন চিহ্নের প্রয়োগ গণিতকে আরও সহজ করেছিল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীদত্ত বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও ইতিহাসবিদ Seidenburg-এর রচিত 'The Orijin of Mathematics' গ্রন্থের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। ...that invention of mathematics of algebra in spirit and substance much before the genesis of the formula in algebra।' এই ভাবে চিহ্নের দ্বারা বীজগণিতের সূত্রের প্রকাশ কখনই Eudid-এর জ্যামিতিতে পাওয়া যায় না যা ছিল সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয় গণিতবিদের অবদান। ফলত Seidenburg বলেছেন, 'More in the spirit of Eudid than Eudid itself।' অধ্যাপক শ্রীদত্ত বিংশশতাব্দীর ভারতীয় আমেরিকান গণিতজ্ঞ শ্রীরাম অভ্যঙ্করের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে Polynomial ও Power series শীর্ষক গাণিতিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন— 'Polynomials and Power Series may for ever rul the World।' তিনি বলেন, আমরা সকলেই অল্পবিস্তর অবগত যে সপ্তদশ শতাব্দীর জগৎবিখ্যাত গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন হলেন এই Polybnomial and Power Series-এর প্রবক্তা, কিন্তু আশ্চর্য হই যখন দেখি সেই সুদূর ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত Algebra of Polynomiels-এর সংজ্ঞা দিচ্ছেন।

তাহলে ১০০০ বছরের অন্তরায়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাই Polynomial সংক্রান্ত চিন্তনের এক সাধারণ মিল। ব্রহ্মগুপ্তের কাজকে বিখ্যাত গণিতবিদ মাধবাচার্য নির্মাণ করেন 'Trigonometive Power Series', আর এই Polynomial-এর উদ্ভবনের মধ্যে যে রহস্য লুকিয়েছিল তার মূলে রয়েছে দশমিক পদ্ধতি অর্থাৎ Decimal System এবং এই পদ্ধতির দ্বারা যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যাকে Polynomial-এর আকারে প্রকাশ করা সম্ভব। দশমিক পদ্ধতি মূলত ২টি আকারে প্রকাশ পায়— (১) দশমিক স্থান নির্ণয়ক মান হিসেবে, (২) মৌখিক আকারে। গণিতের ইতিহাসে এই মৌখিক আকারে প্রকাশই সর্বত্রভাবে উপেক্ষিত অথচ ঋক্‌বেদ এবং তারও আগে এই দশমিক নামকরণ পদ্ধতির ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। সেই নিরিখে দশমিক স্থাননির্ণায়ক মানের প্রচলন খানিকটা সাধারণ খ্রিস্টযুগের আগে (সিসিই)।

কাজেই ইউরোপে দশমিক পদ্ধতির প্রচলন সপ্তদশ শতাব্দীতে আর গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত বড়ো হয়েছিলেন প্রচলিত দশমিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যা তাঁকে Polynomial নির্মাণ করতে সাহায্য করেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দত্ত আইজ্যাক নিউটনের উক্তিটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন— 'Arithmatic of Decimal System is infront of you, then why Won't you copy it to get Algrbra of Polynomials।' ফলত বৈদিক আমলে সৃষ্ট দশমিক পদ্ধতি পরবর্তীকালে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ Lebnitz-এর হাতে যখন সংখ্যার প্রকাশ ঘটে Binary আকারে, যা কিনা আধুনিক কম্পিউটারের হৃদপিণ্ড নির্মাণে সহায়ক হয়ে ওঠে বিভিন্ন প্রকার অফ ও অন-এর মাধ্যমে অর্থাৎ Stringsal Off + On to form the Heart of Computer।' আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টপূর্বে বা তার কিছু আগে মহর্ষি পিঙ্গল প্রবর্তন করেন 'ছন্দসূত্র' যা মূলত দুটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রদান করে ' (১) The idea of the Positional or the place value system grew out of it. (২) It presents the first known description of a binary numeral system in cemnection with systematic enumerations of meters with fixed patternsaf short and long syllables. মহর্ষি পিঙ্গলের এই কাজকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে আর্যভট্টের দ্বারা সৃষ্ট হয় 'Algebra of Line or Solution'। আর্যভট্টের কলনবিধিই আধুনিক কম্পিউটারের কোডিং তত্ত্বের এক প্রধান পদক্ষেপ। এখানে আমরা দেখতে পাই কম্পিউটার বিজ্ঞানে কলনবিধির সর্বপ্রথম নিদর্শন। ৩০০ খ্রিস্টপূর্বে মহর্ষি পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে বেদান্ত নিঃসৃত সংখ্যা কলনবিধি পরবর্তীকালে আর্যভট্টীয়তে আমরা দেখতে পাই বিপরীত অন্তর্নিহিত ব্যবহার যা থেকে সৃষ্ট হয় বীজগণিতের ঘাতের সূচক যা পরবর্তীকালে যে কোনোরকমের গাণিতিক সমস্যার এক সরলীকৃত সমাধান করতে সক্ষম হয়। আচার্য পিঙ্গলের প্রর্বতিত ভাগ ও জয় পদ্ধতিকেই বলা হয় আধুনিক কম্পিউটারের সর্বপ্রথম রূপরেখা। একইভাবে আর্যভট্টীয় স্ফুটসূত্রে এরই বিপরীতের ব্যাপক প্রয়োগে আমরা শূন্যকে এক বিশেষ সংখ্যারূপে দেখতে পাই। এখান থেকে যে অবরোহণের বীজ প্রোথিত হয় যার থেকে জন্ম নেয় ঋণাত্মক অগ্রগতির ফর্মূলা, যাকে বলা যেতে পারে শূন্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

প্রাচীনকালে সংখ্যা যেহেতু স্লেট ইত্যাদিতে লেখা হতো ফলে সহজে মুছে যাওয়ার প্রবণতাকে আটকানোর জন্য মহর্ষি পিঙ্গল প্রর্বতন করেছিলেন সংখ্যার সংযুক্তীকরণ যাকে বলা যেতে পারে, কোডিং, যা এক প্রকার সংখ্যাকে বিনারি রূপে বর্ণনা করার প্রথম পদক্ষেপ। মহর্ষি পিঙ্গল যদিও 'Binary repre sentation of Number'-এর প্রবর্তক নন, সেটি গণিতবিদ lebnitz-এর কৃতিত্ব। তথাপি মহর্ষি পিঙ্গলের বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর নিঃসৃত পর্যায়ক্রম পদ্ধতিই বিনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় পরিবর্তন করা এবং ঠিক বিপরীত ভাবে

দশমিক সংখ্যাকে বিনারি সংখ্যায় পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছে। ফলে Lebritz যদি বিনারি নাম্বারের প্রবর্তক হন তাহলে মহর্ষি পিঙ্গল হলেন 'father of binary operation'। অধ্যাপক দত্ত এরপর আধুনিককালে ভারতীয় গণিতবিদের প্রসঙ্গে উপস্থাপনায় ২০১৮ সালে ফিল্ড মেডল প্রাপ্ত বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ মঞ্জুল ভার্গবের কথা, যিনি গণিতবিদ Gauss-এর করা ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যাতত্ত্বের 'Gauss Composition Law'-কে সরলীকরণ ও সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করেন। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় যা অধ্যাপক দত্ত ব্যক্ত করেন যে এহেন সাফল্যের পেছনেও রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদের অনুপ্রেরণা। মঞ্জুল ভার্গব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক দত্ত ব্যক্ত করেন গণিতবিদ রামানুজমের অবদানের কথা, সংখ্যাতত্ত্বে ও তাঁর ঐন্দ্রজালিক গুণের কথা যা তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে Gauss-এর সূত্রের সমাধানে এবং সেখানেই তিনি আবিষ্কার করেছেন সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্তের 'ভাবনা নীতি' বা সমাস (Samas or Principle of Compostion)। এক ইমেলে শ্রীমঞ্জুল ভার্গব অধ্যাপক অমর্ত্য দত্তকে জানিয়েছেন, 'I know Brahmagupta's Identify from Childhood...Brahmagupta 628AD justblows your mind.'

১৯৯০ সালে ফ্রান্সে প্রকাশিত একটি গবেষণামূলক প্রকরণ গ্রন্থে পঞ্চম অধ্যায়টি ব্যক্ত হয়েছে প্রাচীন ভারতের গণিতের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা এবং সেখানে উল্লেখযোগ্য হিসেবে রয়েছে যার নাম তিনি হলেন সেই সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত। এখানে শ্রীদত্ত দেখান ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের কাজের প্রবহমান ধারা আধুনিক গণিতে কীভাবে এসে পড়েছে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে $Nx^2+C=y^2$ এই জাতীয় সমীকরণকে বর্গ-প্রকৃতি বা কৃতি প্রকৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেখানে 'N' একটি অবর্গপূর্ণ সংখ্যা এবং C একটি পূর্ণ সংখ্যা। কিন্তু C=1 হলে সমীকরণটি হয় $Nx^2+1=y^2$। ওই সমীকরণের সুস্পষ্ট সমাধান হচ্ছে x=0, y=1 যা হলো সমীকরণটির 'Trivial Solution'। ব্রহ্মগুপ্তের আবিষ্কৃত তিনটি সহায়ক উপপাদ্য বার বার প্রয়োগ করে সমীকরণটির অসংখ্য 'non-trivial' পূর্ণ সাংখ্যিক সমাধান পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য, এ সম্বন্ধে প্রথম 'major break through' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ব্রহ্মগুপ্তের ব্যবহৃত 'ভাবনা-নীতি' বা সমাস (Samas or Principle of Composition), 'This composition principle of Brahmagupta is of,m paramount importance in modern algebra and number theory'। ব্রহ্মগুপ্তের আবিষ্কৃত সহায়ক উপপাদ্যগুলি পরে দ্বিতীয় ভাস্কর (১১৫০), জ্ঞানরাজ (১৫০০) এবং কমলাকর (১৬৫৮) বর্ণনা করেন, আর ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে Euler ও Lagraye (1736-1813) অর্থাৎ ১০০০ বছর পরে এতগুলি পুনরাবিষ্কার করে এদের মৌলিক চরিত্র চিহ্নিত এবং উক্ত করেন---'Theorem of Capital importance and a most elegont theorem'। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণটি 'পেল সমীকরণ' হিসেবে আখ্যায়িত হয়। যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ইউলার সমীকরণটিকে সমাধান করেন এবং ভুলবশত 'পেল সমীকরণ' বলে অভিহিত করেন। এর সমাধানের সঙ্গে ইংরেজ গণিতজ্ঞ পেলের কোনো ভূমিকা নেই। এটি আবার Number Theory-তে এক যুগান্তকারী অর্থে গণিতজ্ঞ Gauss-এর (১৮০১ খ্রিস্টাব্দে) করা 'Dauss Composition Law'-তে আমরা ব্রহ্মগুপ্তের করা ভাবনা-নীতির প্রয়োগ বৈশিষ্টের অনন্যতা এক সাধারণ শ্রেণীভুক্তীকরণ দেখতে পাই। আর মঞ্জুল ভার্গব সেই ব্রহ্মগুপ্তের ভাবনা-নীতির অনুপ্রেরণায় Gauss-এর উপপাদ্যকে আরও সরলীকরণ করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্ত রচিত 'কুট্টকঅধ্যয়ে' তিনি যেমন রেখে গেছেন ধ্রুপদী বীজগণিতের আধুনিক সব সূত্র, প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার ব্রহ্মগুপ্ত অবশ্য বীজগণিত কথাটি না ব্যবহার করে করেছিলেন 'কুট্টগণিত' ('কুট্টক' অর্থে গুঁড়া)। কাজেই পাটিগণিতে আমরা যেসব বিষয়ে আলোচনা করি যেমন সংকলিতা, ব্যধালত, গুণন, ভাগহর, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল ইত্যাদি সবকিছুই তিনি বিচার করেছিলেন ত্রৈরাশিক এবং বহুরাশি বিষয়ে। ব্রহ্মগুপ্ত এই ত্রৈরাশিকের গণনা সম্পর্কে সহজ এক সূত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন, সেই সঙ্গে যৌগিক অনুপাত বা বহুরাশিকের প্রয়োগ প্রণালীও বর্ণনা করেছিলেন। শূন্যকে সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার এবং এর পাটিগণিত বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মগুপ্তের কৃতিত্ব অনন্য এবং তিনি হলেন এক্ষেত্রে পুরোধা অথচ তিনি সেই কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত যার, পুনরর্চনার বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

অধ্যাপক অমর্ত্যকুমার দত্ত তাঁর মহতী ভাষণের দ্বারা সেই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কালে গণিতে ভারতীয়দের অবদানের কথা যে ভাবে ব্যক্ত করলেন ব্রহ্মগুপ্তের 'ভাবনা-নীতি'র বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সেই মহতী সভায় সেই প্রাচীন ভাবে উদ্বেলিত হয়ে মন্থন করার প্রয়াস করতে থাকি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমোঘ কীর্তিকে। কারণ গণিতকে বলা হয় সভ্যতার দর্পণ। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে চাই ভারতীয় গণিতের বিকাশের পরম্পরাকে বোঝা যা গণিতের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সঠিক প্রকল্প গ্রহণ ও গণিত সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। □

With best compliments from -

A Well Wisher

পরলোকে শিলচরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক পান্নালাল বক্সী

বলরাম দাস রায়।। লোকান্তরিত হলেন শিলচরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক পান্নালাল বক্সী। তিনি দক্ষিণ অসমের একজন স্বনামধন্য চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। দক্ষিণ অসমের শিলচরের স্বয়ংসেবক হলেও তিনি পড়াশোনার জন্য দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম কম এবং এলএলবি পাশ করেন। ওই সময় তিনি সঙ্ঘের ভবানীপুরে ৮৪ নং কার্যালয়ে থাকতেন। তৎকালীন ক্ষেত্র প্রচারক একনাথজীর তিনি স্নেহধন্য ছিলেন। ওই সময় দক্ষিণ কলকাতার ভাগ কার্যবাহের দায়িত্বে ছিলেন। পড়াশোনা সমাপ্ত করে পশ্চিমবঙ্গেই তিন বছর সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে সময় দিয়েছেন। আমি যখন কলকাতায় স্বয়ংসেবক হই, তখন তিনি কলকাতার জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে যখন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে তিনদিনের শিবির হয়েছিল তখন পান্নাদাকে বিশেষ ভূমিকায় দেখেছিলাম। ভালচন্দ্র গোখলেজীর সঙ্গে ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্য পাইনি। তিনি পড়াশোনা শেষ করে শিলচরে ফিরে গিয়ে ব্যবসায় (সিএ) মনোনিবেশ করেন এবং অচিরেই সক্রিয় গৃহী কার্যকর্তারূপে সঙ্ঘ পরিমণ্ডলে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে আমি যখন ত্রিপুরা জেলা প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে যাই তখন পান্নাদাকে নতুন করে পেয়েছিলাম। ২০০১ সালে যখন শিলচর বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পাই তখন খুব নিকট থেকে পান্নাদার সান্নিধ্য লাভ করি। কলকাতা থেকে কার্যকর্তারা শিলচরে এলে পান্নাদার বাড়িতে অবশ্যই যেতেন। তাঁদের কাছে পান্নাদা পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজের খোঁজখবর নিতেন। পান্নাদা শিলচরে সঙ্ঘের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। পরবর্তীকালে ভারত বিকাশ পরিষদ ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। একদিকে যেমন তাঁর সঙ্গে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওঠাবসা ছিল, তেমনই চা-বাগান ও জনজাতি এলাকার মানুষদের সঙ্গেও মধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি শিলচরে অনেক সামাজিক সংস্থারও কর্ণধার ছিলেন। সমাজ উত্থানের কাজে সমগ্র অসমে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে দক্ষিণ অসমের সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের কাছে পান্নাদার কর্মপদ্ধতি পাথেয় হয়ে থাকবে।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির স্বয়ংসেবক প্রবীণ আগরওয়ালের মাতৃদেবী সাবিত্রীদেবী আগরওয়াল গত ৬ জানুয়ারি বিহার রাজ্যের কিষণগঞ্জের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।
উল্লেখ্য, তাঁর প্রয়াত স্বামী বালচন্দ্র আগরওয়াল প্রখ্যাত আইনজীবী এবং উত্তর বিহার প্রান্তের সহ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার খরবা শাখার স্বয়ংসেবক অভিজ্ঞান বর্মনের পিতৃদেব গিরীন্দ্রনাথ বর্মন গত ১৫ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

শোকসংবাদ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার পূর্বতন সভাপতি রণেন্দ্রনারায়ণ রায় গত ৯ জানুয়ারি কলকাতায় নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি ছিলেন। অবসর জীবনে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা পূর্বভাগ সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব নির্বাহ করেন। সঙ্ঘের প্রাদেশিক বৈঠকে স্বস্তিকা সম্পর্কে তাঁর আবেগময় ভাষণ অনেকের মনে আছে। পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বংয়সেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি খণ্ড কার্যবাহ আশিস দাস গত ১৭ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। তিনি তাঁর মা ও সহধর্মিণীকে রেখে গেছেন।

* * *

হাওড়া শিবপুরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও 'মাস্টারমশাই' কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পুত্র দেবব্রত চক্রবর্তী গত ৪ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মধ্য হাওড়ার মা কালী শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, কন্যা, ভাই-বোন ও অসংখ্য অনুরাগীকে রেখে গেছেন।

ময়নাগুড়ি রেল দুর্ঘটনা : সেবাকাজে অগ্রণী ভূমিকায় সঙ্ঘ ও সেবা ভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৩ জানুয়ারি এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সাক্ষী হয় জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি। বিকানের-গৌহাটি এক্সপ্রেসের একাধিক কামরা লাইনচ্যুত হয় । ৯ জনের মৃত্যু হয়, আহত হন শতাধিক মানুষ।

ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার খবর আসতেই রাজ্য পুলিশ, বিএসএফ, এনডিআরএফ, রেল পুলিশের সঙ্গে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন ময়নাগুড়ি খণ্ডের স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা। ট্রেন থেকে আহত যাত্রীদের বের করে নিয়ে আসা, তাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠানো, চা ও গরম জলের ব্যবস্থা— সব কাজেই হাত লাগান স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা। এগিয়ে আসে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সেবা ভারতী ও ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় কার্যকর্তারাও।

একদিকে সন্ধ্যা পেরিয়ে সারা রাত এবং পরেরদিন ১৪ জানুয়ারি, সারাদিন জল, চা, গরম জল, শুকনো খাবারের ব্যবস্থা ও সরবরাহ করা হয়। অন্যদিকে দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীদের দিকে সচেতন দৃষ্টি থাকায় লুঠ ও চুরির কোনো ঘটনারও খবর পাওয়া যায়নি।। সেবা ও সুরক্ষার পাশাপাশি স্বচ্ছতা বিষয়েও সজাগ ছিলেন স্বয়ংসেবকরা। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয়-সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত নিজে সেবাকাজে অংশ নিয়ে বাকি কার্যকর্তাদের উৎসাহ প্রদান করেন।

এর পাশাপাশি জলপাইগুড়ি নগর ও শিলিগুড়ি নগর ও শিলিগুড়ি নগরের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। হেল্পলাইন নম্বরের ব্যবস্থা, রক্তদানের ব্যবস্থা, এনজেপি স্টেশন ও বাগডোগরা বিমানবন্দরে সহায়তাকেন্দ্র, জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা-সহ নানা বিষয়ে যোজনা গ্রহণ করা হয় ও সেই মতো কাজ শুরু হয়। দুই নগরেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ছাড়াও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ও ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় কার্যকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এনএমও-র চিকিৎসক বন্ধুরাও সেবাকাজে এগিয়ে আসেন।

জলপাইগুড়ি হাসপাতালে রক্তদানের ব্যবস্থাও করেন স্বয়ংসেবকরা। আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বাড়িতে যোগাযোগ করা ও বাড়ির পরিজনদের খবর দেওয়া হয়। সেখানেও শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে সারারাত জেগে সহায়তা করেন শিলিগুড়ির কার্যকর্তারা। জলপাইগুড়ি হাসপাতাল থেকে রেফার হওয়া রোগীদের ভর্তির বিষয়ে এখানে সহায়তা করা হয়।

দীনদয়াল অন্ত্যোদয় জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন এবং স্টার্টআপ গ্রাম উদ্যোক্তা কর্মসূচি স্বনির্ভরতার যাত্রার সহায়ক হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন এবং স্টার্টআপ গ্রাম এন্টারপ্রেনারশিপ প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছিল।

দীনদয়াল অন্ত্যোদয় জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন শুরু হওয়ার পর থেকে, ৮০৪ কোটি মহিলাকে ৭৩.৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, ২০১৬ সালে চালু হওয়া স্টার্টআপ গ্রামের উদ্যোক্তা কর্মসূচির মাধ্যমে এক লক্ষ ৭৮ হাজারেরও বেশি গ্রামীণ শিল্পকে সহায়তা করা হয়েছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, চলতি আর্থিক বছরে ব্যাঙ্কগুলি ২৭.৩৮ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৬২,৮৪৮ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়েছে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য এই মিশনে এখন ওভারড্রাফ্ট সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।

ভুটানের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কারে ভূষিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ করোনা সংকটের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পাচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ ভুটান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাদের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার 'নাগদাগ পেল গি খোরলো' সম্মানে ভূষিত করেছে।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকৃত বন্ধুর দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্মান প্রদানের জন্য ভুটানকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে জানান, 'ধন্যবাদ, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী! আপনাদের এই সম্মান আমাকে অভিভূত করেছে এবং ভুটানের রাজাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ভুটানের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পাওয়ার পর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে পিছনে ফেলে ২০২১ সালের সবচেয়ে পছন্দের নেতার তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছেন। ইউগভ নামে ব্রিটেনের গবেষণা সংস্থা ৩৮টি দেশের ৪২,০০০ মানুষের উপর সমীক্ষা চালিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সৌদি আরব ২০১৬ সালে, ২০১৮ সালে আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, ২০১৯ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, আমেরিকা 'লিজঁইয় অব মেরিট' পুরস্কারে সম্মানিত করেছে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিওল পিস প্রাইস কালচার ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৮ সালের সিওল শান্তি পুরস্কার, ২০১৯ সালে ইউনাইটেড নেশনস চ্যাম্পিয়ন্স অব আর্থ এবং ফিলিপ কোটলার প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড, ২০২১ সালে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন থেকে গ্লোবাল গোলকিপার অ্যাওয়ার্ড, কেমব্রিজ এনার্জি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটস থেকে পরিবেশ নেতার পুরস্কার পেয়েছেন।

কিষান রেল : কৃষক এবং রেল একইভাবে লাভবান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০২১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের ঘটনা, সেই প্রথম কিষান রেল ২১৬ টন পেঁয়াজ নিয়ে রাজস্থানের আলওয়ার থেকে অসমের ভেটাপাড়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। আলওয়ার থেকে ভেটাপাড়া পর্যন্ত ২২০ টন পেঁয়াজ নিয়ে যেতে খরচ হয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। কিন্তু কিষান রেল যোজনার মাধ্যমে ৫০ শতাংশ ভরতুকি দেওয়ার কারণে, কৃষকদের জন্য মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল।

আলওয়ারে কৃষকরা প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম পেয়েছিলেন ২০ টাকা পর্যন্ত, অন্যদিকে অসমে তারা প্রতি কেজি ২৬ টাকার বেশি পেয়েছেন। কৃষকরা যাতে দূরবর্তী, বৃহৎ ও আরও লাভজনক বাজারে প্রবেশ করতে পারেন এবং সেই লক্ষ্যে বিশাল রেল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে সক্ষম হন, তার জন্য ২০২০ সালে কিষান রেল চালু করা হয়। এটি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিপূরক।

২০২০ সালের ৭ আগস্ট এটি চালু হওয়ার পর থেকে পচনশীল সবজি ও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে সারা দেশে ১৬৪২ বার যাত্রা করেছে। রেলওয়ে এ থেকে প্রায় ২২০ কোটি টাকা আয় করেছে। লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন এই তথ্য প্রদান করে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, 'শাকসবজি, ফল ও অন্যান্য পচনশীল পণ্য পরিবহণের সম্ভাব্য সার্কিটগুলি কৃষক ও কৃষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত চাহিদার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সবজি ও ফলের মতো পচনশীল পণ্যের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধার ব্যবহার করা হচ্ছে।

শোকসংবাদ

হাওড়া মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক মিহির কুমার সেনগুপ্ত গত ১২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তরুণ বয়সে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। খ্যাতনামা আইনজীবী। আয়কর বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ন্যাশনালিস্ট লইয়ার্স ফোরাম, কেশবচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি প্রভৃতি সংগঠনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

প্রবীণ স্বয়ংসেবক গোপালদাস আগরওয়াল গত ১৮ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি মূলত উত্তরপ্রদেশের স্বয়ংসেবক। ১৯৬০ সালে কলকাতা নিবাসী হন। ১৯৭১ সাল থেকে হাওড়া নিবাসী।

মণিপুরে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বাধীনতার পর ভারতের অনেক রাজ্য, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিল। রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল ও ভূমিরূপের জন্য এই অঞ্চলকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করতে একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো প্রয়োজন। বিকাশের ক্ষেত্রে ২০১৪ সাল থেকে এই রাজ্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। এর কারণ হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি, তিনি উত্তর-পূর্বকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার চালিকা শক্তি বলে মনে করেন। মণিপুরে বিশ্বের সর্বোচ্চ সেতুর নির্মাণ উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির আরেকটি উদাহরণ হতে চলেছে। এই সেতুটি ১১১ কিলোমিটার দীর্ঘ জিরিবাম-ইম্ফলে রেলওয়ে প্রকল্পের একটি অংশ। এর লক্ষ্য হলো মণিপুরের রাজধানীকে দেশের ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা। সেতুটিকে ভূমিকম্প প্রতিরোধী করা হচ্ছে। এটি রিখটার স্কেলে ৮.৫ মাত্রার ভূমিকম্প সহ্য করতে পারবে। প্রকল্পটি শেষ হলে ১১১ কিলোমিটার দূরত্ব মাত্র আড়াই ঘণ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে, জিরিবাম-ইম্ফলের (এনএইচ-৩৭) মধ্যে দূরত্ব ২২০ কিলোমিটার এই রাস্তা যেতে সময় লাগে প্রায় ১০-১২ ঘণ্টা। নির্মাণের পর ননি উপত্যকা অতিক্রমকারী সেতুটি হয়ে উঠবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পিয়ার ব্রিজ। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সেতুটির নির্মাণকার্য শেষ হবে।

বিশ্ব বাজারে স্বমহিমায় হাজির খাদি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ফ্যাশন ব্র্যান্ড হিসেবে ভারতের খাদি বিশ্বজুড়ে মানুষের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই ভারতের খাদি কীভাবে মেক্সিকোয় ‘ওহাকা খাদি’ ব্র্যান্ডে পরিণত হয়ে উঠেছে তার কথা বলেন। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাটাগোনিয়া, এখন ডেনিম পোশাক তৈরির জন্য হস্তশিল্পের খাদি ডেনিম ফ্যাব্রিক ব্যবহার করছে। ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেক্সটাইল সংস্থা অরবিন্দ মিলের মাধ্যমে প্যাটাগোনিয়া গুজরাট থেকে ১.০৮ কোটি টাকার প্রায় ৩০,০০০ মিটার খাদি ডেনিম ফ্যাব্রিক কিনেছে। খাদি ডেনিম কেনার ফলে খাদি কারিগরদের জন্য অতিরিক্ত ১.০৮ লক্ষ ‘ম্যান-আওয়ার’ কাজ করতে হয়েছে। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে খাতি এবং গ্রামীণ শিল্প কমিশন সারা বিশ্বে খাদি ডেনিম পণ্যের ব্যবসা করার জন্য অরবিন্দ মিলস লিমিটেড, আহমেদাবাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে।

ভারতের প্রশংসনীয় রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এই প্রথমবার ভারতের লিঙ্গ অনুপাত আশাপ্রদ নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০২০ : ১০০০

ভারতের অর্থনীতি ২০১৪ সালে দশম স্থানে ছিল, ৮০০ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধির সঙ্গে ২০২১ সালে ভারত ষষ্ঠ স্থান উঠে এসেছে।

অটোমোবাইল ক্ষেত্রে ২০১৪ সালে ভারত সপ্তম স্থানে ছিল, ২০২১ সালে মেক্সিকোকে ছাড়িয়ে ষষ্ঠ স্থানে চলে এসেছে।

ভারত ভিয়েতনাম, কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্মার্টফোন নির্মাতা হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের সমস্ত রেটিং এজেন্সি ভারতের জিডিপির জন্য প্রবৃদ্ধির অনুমান বৃদ্ধি করেছে।

উজ্জ্বলা, স্কিম ও আয়ুষ্মান ভারতের মতো উদ্যোগগুলি দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেছে।

বিশ্ব প্রদান সূচক ২০২১ সাল অনুযায়ী ভারতের অবস্থান ১৪, ২০১৪ সালে ভারত ৬৯তম স্থানে ছিল। চলতি অর্থবছরের শেষের দিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে রয়েছে।

নতুন ভারত সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। ভারত এখন জলবায়ু পরিবর্তন কর্মক্ষমতা সূচকে দশম স্থানে রয়েছে, ২০১৪ সালে ভারত ৩০ নম্বর স্থানে ছিল। বিশ্বের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যার নিরিখে, ২০১৪ সালে ভারত দশম স্থানে ছিল, এখন দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে।

ইস্পাত তালিকায় ২০১৪ সালে ভারতের চতুর্থ অবস্থান থেকে এখন দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। উদ্ভাবনী তালিকায় ২০১৪ সালেস ভারতের স্থান ছিল ৭৬, এখন তা হয়েছে ৪৬। বিশ্ব পর্যটন তালিকায়, ভারত ৩৪তম স্থানে উঠে এসেছে, ২০১৩ সালে তা ৬৫তম স্থানে ছিল।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২২।।